পুঁজি থাকছে না

শাহ্ আলম

প্রকাশনায়:

ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম
বাজার জগতপুর, পোষ্ট কোড-৩৫৬২
চাঁদপুর, বাংলাদেশ।

Web-site: www.icwfreedom.org
e-mail: icwfreedom@gmail.com>
.
On line group: https://www.facebook.com/groups/whatandwhy2/
https://www.facebook.com/groups/What.Why/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.REVOLUTION.UNIVERSAL/
https://www.facebook.com/groups/forcommunism/
https://www.facebook.com/groups/COMMUNIST.PARTY.GLOBAL/
https://www.facebook.com/groups/800059110018317/
Page: https://www.facebook.com/www.icwfreedom.org
Mob: (880) +01715345006.
প্রকাশ কাল: জুলাই-২০১৭।

মুদ্রণে- দি চিত্রা প্রিন্টার্স
২০, নীলক্ষেত,ঢাকা-১২০৫।

বিনিময়: ৮০ টাকা।

ভূমিকা

পুঁজি থাকছে না- এই সত্য, প্রামাণ্য তথ্য -উপাত্ত সহ প্রকাশ করেছিলেন পুঁজির গোপন রহস্য উদ্ঘাটনকারী কার্ল মার্কস। (৫ মে, ১৮১৮- ১৪ মার্চ, ১৮৮৩) তিনি পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র নিয়ে গবেষণা করেছেন ৪০ বছরের বেশী সময়। কেবলমাত্র ডাস ক্যাপিট্যাল বা পুঁজি নামে লিখেছেন ৬ খানি পুস্তক। তার বন্ধু ফেডারিখ এ্যাংগলেস (২৮ নভেম্বর, ১৮২০- ৫ আগষ্ট, ১৮৯৫) পুঁজি গ্রন্থের সম্পাদনা সহ মার্কসের আবিস্কৃত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে যেমন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন তেমন মার্কসের সাথে সহমত পোষণ করে -পুঁজিতান্ত্রিক সমাজই যে, ইতিহাসে শেষ শ্রেণী বিভাজিত সমাজ তা প্রমাণ্য তথ্যাদি সমেত প্রকৃতি বিষয়ে লিখেছেন নানান নিবন্ধ। কমিউনিস্ট লীগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী খুব অল্প বয়সে তারা দুজনে যৌথভাবে লিখেছেন কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো, যা প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে। পুঁজিতন্ত্রী সমাজ বিলীনে শ্রমিক শ্রেণীর ১ম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা (১৮৬৪) ও তার জন্য প্রচুর লেখা-লেখি করতে হয়েছে দুজনকেই। ফলে, আমেরিকা সহ শিল্পোন্নত দুনিয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে তাদের রচনাবলী যেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে তেমন পুঁজিতন্ত্র বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। তাতে, কমিউনিস্ট পার্টির ম্যানিফেস্টো প্রকাশের পূর্বেই বিলোপ আতংকে ভূতাংকিত পুঁজিপতি শ্রেণী আরো ভয়ানক আতংকে আতংকিত হয়। কিন্তু, পুঁজি থাকছে না, এই সত্য কবুল করতে রাজী নয় পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপাদনী সূত্রে মজুরের শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী।

অতঃপর, সামাজিক যে নিয়মে সামন্ত শ্রেণীকে উৎখাত করে পুঁজিপতি শ্রেণী দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠা করেছে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি সেই নিয়মকে অস্বীকার করে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী টিকে থাকার জন্য আশ্রয় নেয় নানান মত-পথ সমেত নানান ছলা-কলা ও জাল-জালিয়াতির, যাতে পুঁজি ও পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা এবং পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাবলী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে সৃষ্টি হয় ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি; এবং পণ্য উৎপাদনী সূত্রে শোষক-শোষিতের বিরোধে জড়িত দুনিয়ার বুর্জোয়া ও মজুর এই দুই শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি- পুঁজিমুক্ত তথা পণ্য মুক্ত অর্থাৎ মজুরি প্রথা মুক্ত তথা কেনা-বেচা মুক্ত অর্থাৎ শোষণ মুক্ত, তাই শ্রেণী ও শ্রেণী শাসন মুক্ত সমাজ- সমাজতন্ত্র অর্জনে দেশহীন, জাতি হীন তবে পুঁজির স্রষ্টা দুনিয়ার মজুরেরা একতাবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র এবং স্বীয় শ্রেণী পরিচয়, স্বীয় শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী মুক্তি বিষয়ে বুর্জোয়াদের প্রচারিত নানান মিথ্যাচার, প্ররোচনা ও উদ্দেশ্যজাত রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত, আচ্ছন্ন ও মোহাচ্ছন্ন হয়ে বুর্জোয়াদের কবর খোদক -মজুর শ্রেণী জাত, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, দেশ ইত্যাদিতে ভাগ-বিভাগ হয়ে স্বীয় শ্রেণী পরিচয় ভুলে নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বজ্জাত-ভন্ড বুর্জোয়াদের সেবা করে।

এই সব দুস্কর্মে কমিউনিস্ট তথা বিজ্ঞানী মার্কসকে অবমূল্যায়ন করা সমেত সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে বিকৃত করা জরুরী হয়ে দেখা দেয় জালিয়াত বুর্জোয়া শ্রেণীর নিকট। তাই, মার্কসকে কথিত মতাদর্শের স্রষ্টা এবং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে আড়াল করে বানোয়াটি " মার্কসবাদ" উপস্থাপনের হীন চক্রান্ত করাটাও শোষক-জালিয়াত বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ল। উল্লেখ্য, সকল মতাদর্শের সমাপ্তি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক সমাজ-সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিকল্পহীন শর্ত এবং সমাজতন্ত্রে সকলেই বিজ্ঞানী। তাই, কমিউনিস্ট তথা সমাজতন্ত্রী মাত্রই বিজ্ঞানী।

শ্রেণীহীন সমাজের ভিত্তি- পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় অক্ষম শাসকগণ বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের শাসনে অক্ষম হওয়ায় বুর্জোয়া শ্রেণী যেকোনো মূল্যে টিকে থাকার অপকৌশলের অংশ হিসাবে ২য় আন্তর্জাতিকের প্রভাবশালী নেতাদের মাধ্যমে তথাকথিত জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ (১৮৯৬) করে কার্যত পুঁজিতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনকে কেবলমাত্র তখনকারমতো ইতিই টানেনি বরং ২য় আন্তর্জাতিকের বিলোপও নিশ্চিত করেছে। পরবর্তীতে বিলুপ্ত ২য় আন্তর্জাতিকের জাতীয়

মুক্তির রাজনীতির ধারক, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া পার্টি- বলশেভিক পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা লেনিনের পরিকল্পনায় একটি পরিকল্পিত সামরিক ক্যুয়ের মাধ্যমে রাশিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এটিকেই শ্রমিক মুক্তির রাষ্ট- সমাজতন্ত্র হিসাবে দুনিয়াব্যাপী প্রচার করে কেবল কমিউনিস্ট বিপ্লব,কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিজম বিষয়েই নয় বরং পুঁজিতন্ত্র বিষয়ে চরম মিথ্যাচার করে পুঁজি ও পুঁজির অন্তর্ধান বিষয়ে খোদ মজুর শ্রেণীকে মারাত্মক ভ্রান্তি ও ভয়ানক বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন করতে সাময়িকভাবে হলেও সফল হয়েছে লেনিনবাদী দলগুলো।

কিন্তু, যতো চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র করুক অথবা পুঁজি বিষয়ক প্রশ্নে তৈরী করুক ভুয়া তথ্য বা সমাজতন্ত্র প্রসংগে মিথ্যাচারে ভরপুর বানোয়াটি গাল-গল্প তৈরী করুক চালবাজ বুর্জোয়াশ্রেণী তাতেও টিকে থাকার সুযোগহীন বটে বুর্জোয়া শ্রেণী যেমন পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে তেমন বুর্জোয়া শ্রেণীর টিকে থাকারই শর্তে। তাছাড়া,পুঁজি যেমন কাল্পনিক বিষয় নয় তেমন বাস্তবের পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাও মুক্ত নয় সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম হতে। তাই, সমাজ পরিবর্তনের নিয়মে পুঁজিতন্ত্রও যাবে।

কিন্তু, পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র বিষয়ে জানা-বুঝা বিকল্পহীন শর্ত বটে পুঁজিতন্ত্র বিলোপকারী শ্রমিক শ্রেণী বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি গড়ে তুলবে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একতাবদ্ধ করতে এবং ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি বুঝে ও বিবেচনা করে পুঁজিতন্ত্রের বিলুপ্তিতে স্বীয় মুক্তি লাভে স্বাধীনতা প্রত্যাশিতদের।

শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি গড়ে তোলার প্রয়োজনে কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনে সহায়তা করতে প্রতিষ্ঠিত **ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম** এর বিগত বার্ষিক কাউন্সিলের আলোচ্য বিষয় হিসাবে আমি " পুঁজি থাকছে না" নিবন্ধটি লিখি ও উপস্থাপন করি। সেটিই এখন প্রকাশিত হচ্ছে।

উল্লেখ্য- অগণ পণ্যের সমাজ পুঁজিতন্ত্র প্রতিনিয়ত নতুন নতুন পণ্য উৎপন্ন করে। এসব পণ্য টাকা দিয়ে কিনে ভোগ ও ব্যবহার করে বেঁচে থাকতে হয় বলে পুঁজিতন্ত্রে সকলেই টাকার পাগলা ঘোড়ার সোওয়ারী হতে যারা পর নাই তৎপর। তদুপরি, যার যত বেশী টাকা তথা পুঁজি অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী সম্পত্তি তথা পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের উপায়াদি আছে সে ততবেশী পণ্য ভোগ-ব্যবহার করার সুযোগ পায় কেবল এমনটা নয় বরং তাদের সামাজিক ক্ষমতাও বেশী। তাই, স্বীয় পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পুঁজির মালিকেরা যেমন তীব্র প্রতিয়োগিতায় লিপ্ত তেমন পুঁজিহীন তবে পুঁজি উৎপন্নকারী মজুরেরাও বুর্জোয়াদের নানান বিভ্রান্তিকর প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হয়ে এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য মজুরদের একটি পার্টি না থাকায় মজুরেরাও পুঁজির পিছনে দৌড়ায়।

অথচ, পুঁজি তথা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হচ্ছে মজুরদের সকল দুর্ভোগ, দুরাবস্থা ও দুর্দশার কারণ। আর অনিশ্চয়তার নিশ্চিত সমাজ পুঁজিতন্ত্রে পুঁজিতন্ত্রীরাও অনিরাপদ ও অনিশ্চিত জীবন যাপন করে। প্রকৃত অর্থে পুঁজিতন্ত্রই সকলের সকল সমস্যা ও দুর্দশার কারণ। অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রকে বিদায় করা ছাড়া মুক্তির কোনো বিকল্প নাই। তবে, লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, মাওয়ের মতো কোনো নেতা বা গুরু যেমন পুঁজিতন্ত্রকে দূরীকরণে আবশ্যক নয়, তেমন একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার মজুরদেরকে একতাবদ্ধকরণে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টিও কেবল আবশ্যক নয় বরং বিকল্পহীন শর্ত। সেই পার্টি গঠনে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান জানা-বুঝা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান বুঝতে পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র জানা-বুঝা কেবল সহায়কই নয় বরং বিকল্পহীন শত। আর, পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র বুঝলেই বুঝা যাবে যে, পুঁজি তার অস্তিত্বের শর্তেই অস্থিত্বহীন হবে কেবলমাত্র মজুর শ্রেণী কর্তৃক।

শাহ্ আলম

ঢাকা, ২০ মে, ২০১০।

পুঁজি থাকছে না

পুঁজি- সর্বাধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। কিন্তু, থাকছে না। কারণ, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদি। অর্থাৎ পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার শর্তেই পুঁজির অন্তর্ধান অনিবার্য। পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাধীন পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্তও কিন্ত পুঁজি সমেত পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলোপনে কেবল অনুঘটক নয় বরং নিয়ামকও।
পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত দুটি: **(১) পুনরুৎপাদন; এবং (২) সঞ্চালন।**
পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত হলে পুঁজি শ্রম শক্তি ক্রয়ে ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ পুঁজি পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগ করার অর্থ হচ্ছে শ্রম শক্তি ক্রয় করা। শ্রম শক্তির ক্রিয়া হচ্ছে শ্রম। অতঃপর, পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকের শ্রম শক্তির ক্রিয়া- শ্রমে উৎপন্ন হয় পণ্য। পণ্য হচ্ছে একটি দ্রব্য যার ব্যবহারিক ও বিনিময় মূল্য আছে। তাই, পণ্য ব্যবহার করতে পণ্যের বিনিময় মূল্য প্রদান করতে হয়। উল্লেখ্য, পণ্যের উপাদান দুটি। একটি হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ, যার ব্যবহার মূল্য আছে কিন্তু বিনিময় মূল্য নাই। তাই, পণ্যের বিনিময় মূল্যে প্রাকৃতিক সম্পদের কোন হিস্যা বা অংশীদারীত্ব নাই। সুতরাং, পণ্যের বিনিময়মূল্য হচ্ছে পণ্যের অপর উপাদান- শ্রম, অর্থাৎ পণ্যটি উৎপন্নে যে পরিমাণ শ্রম নিষিক্ত হয়েছে ঠিক সেই পরিমাণ হচ্ছে পণ্যটির মূল্য তথা পণ্যটির বিনিময় মূল্য। কিন্ত,পণ্য উৎপাদনে শ্রম শক্তির ক্রেতা-পুঁজিপতি, শ্রম শক্তির বিক্রেতা- মজুরকে প্রদান করে মজুরি, যা হচ্ছে মজুরের শ্রম শক্তির উৎপাদন ব্যয়।
পণ্য উৎপন্নে পুঁজিপতি দুই ভাবে পুঁজি বিনিয়োগ করে।
(১) **স্থায়ী পুঁজি**: যা, যন্ত্রপাতি সমেত কারখানা,গুদামঘর ইত্যাদি নির্মাণ, প্রতিষ্ঠা ও সেসব মেরামত-আধুনিকায়ন, রক্ষণা-বেক্ষণ,কাঁচামাল ও বিদ্যুৎ, পানি ইত্যকার খাতে ব্যয় হয়। এক কথায়, পণ্য উৎপাদনে মজুরী খাত ব্যতিত অপরাপর সকল খাতে বিনিয়োজিত পুঁজি হচ্ছে স্থায়ী পুঁজি। অতঃপর, প্রতিটি পণ্যে আনুপাতিক হারে স্থায়ী পুঁজি সম পরিমাণ মূল্য সংযোজন করে। অর্থাৎ প্রতিটি পণ্য স্থায়ী পুঁজি হতে যে পরিমাণ অংশ গ্রহণ করেছে, পণ্যটিতে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্য, স্থায়ী পুঁজি হতে সংযোজিত হয়েছে। অর্থাৎ স্থায়ী পুঁজি নতুন পণ্যে নিষিক্ত হয় কিন্তু, তা নতুন মূল্য উৎপন্ন করে না। তাই, স্থায়ী পুঁজি হতে কোন বাড়তি বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয় না। সুতরাং, স্থায়ী পুঁজি হতে পুঁজিপতি তার জন্য কোনো অতিরিক্ত মূল্য হাসিল করে না।
(২) **অস্থায়ী পুঁজি**: পণ্য উৎপন্নে শ্রম শক্তি ক্রয় খাতে মজুরি হিসাবে পুঁজিপতি মজুরকে যা প্রদান করে তা হচ্ছে অস্থায়ী পুঁজি। উল্লেখ্য, একটি নির্দিষ্ট সময়ের

জন্য নির্দিষ্ট মজুরির বিনিময়ে মজুর বিক্রি করে তার শ্রম শক্তি। কিন্তু, ঐ নির্দিষ্ট সময়ে মজুরের শ্রম-শক্তির ক্রিয়া-শ্রম নিষিক্ত হয় পণ্যে। সুতরাং, এই নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ শ্রম নিষিক্ত হয় পণ্যে ঠিক সেই পরিমাণ মূল্য সংযোজিত হয় পণ্যে। তবে, উৎপন্ন পণ্যের মালিক তাই, পণ্য মূল্যের মালিক বটে শ্রম শক্তির ক্রেতা পুঁজিপতি।এতে কোন সন্দেহ নাই যে পুঁজিপতি অস্থায়ী পুঁজি হিসাবে যে পরিমাণ বিনিয়োগ করেছে যদি সেই পরিমাণ মূল্যই অস্থায়ী পুঁজি হতে উৎপন্ন হয়, তবে পুঁজিপতি খামোখা তার পুঁজি বিনিয়োগ করত না। অর্থাৎ স্থায়ী পুঁজি হতেও অতিরিক্ত কিছু পাবে না, আবার অস্থায়ী পুঁজি হতেও যদি পুঁজিপতি অতিরিক্ত কিছু না পায়,তবে পুঁজিপতি কেন পণ্য উৎপাদন করবে? এমন কি, পুঁজিপতি হিসাবে তার ভরণ-পোষণের অর্থ আসবে কোত্থেকে?

অতঃপর, প্রকৃত সত্য হচ্ছে স্থায়ী পুঁজি একটি পণ্যে যে পরিমাণ মূল্য সংযোজিত করেছে এবং ঐ মূল্যের সহিত অস্থায়ী পুঁজি যে পরিমাণ মূল্য সংযোজন করেছে তার সমপরিমাণ অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী এই উভয়খাতের পুঁজি হতে সংযোজিত মূল্যের যোগফল হচ্ছে ঐ পণ্যটির মূল্য। তাই, পণ্যটি ঐ পরিমাণ মূল্যে বিক্রি হয়। কিন্তু, পণ্যটির দাম হতে স্থায়ী ও অস্থায়ী পুঁজিখাতে ব্যয়িত মোট অর্থ বাদ দেওয়ার পর কিছুটা অর্থ অর্থাৎ মূল্য অবশিষ্ট থাকছে। এই অবশিষ্ট মূল্য পণ্য মালিক পায় উদ্বৃত্ত-মূল্য হিসাবে।

অতঃপর, স্থায়ী পুঁজি হতে নয়, বরং এই অবশিষ্ট বা অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হয়েছে অস্থায়ী পুঁজির হিস্যা হতে। অর্থাৎ পণ্য উৎপন্নে মজুর যে পরিমাণ মজুরি পায় সে পরিমাণ মূল্য উৎপন্ন করার পরও সে আরো কিছু মূল্য উৎপন্ন করে চুক্তিকৃত সময়ের শ্রমে। অর্থাৎ, চুক্তিকৃত শ্রম সময়ের একটি নির্দিষ্ট সময়ে মজুরেরা তাদের মজুরির সম পরিমাণ মূল্য উৎপন্ন করে এবং অবশিষ্ট বা উদ্বৃত্ত সময়ে তারা অতিরিক্ত মূল্য বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করে। তাই,মজুরেরা মজুরির বিপরীতে পণ্যটিতে যে পরিমাণ মূল্য সংযোজন করেছে তা তাদেরকে দেয় মজুরি অপেক্ষা বেশী। অতঃপর, এই বেশী বা অতিরিক্ত মূল্য উৎপন্নে পণ্য মালিককে কোন ব্যয় করতে হয়নি। কিন্তু, ব্যয় না করেও পণ্যের মালিক হিসাবে এই উদ্বৃত্ত-মূল্যের মালিক বটে পুঁজিপতি। অর্থাৎ পণ্যের যে অংশের জন্য পণ্য মালিক কোনো ব্যয় করেনি, পণ্যের সেই অপরিশোধিত অংশ হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য।

বস্তুত, মজুরের শ্রমে উৎপন্ন পণ্যের যে অংশের জন্য পণ্য মালিক কোন অর্থ পরিশোধ করেনি অথচ, শ্রম শক্তির ক্রেতা হিসাবে পণ্যের ঐ অপরিশোধিত অংশের মালিক হিসাবে পণ্যের অপরিশোধিত অংশের মূল্যের মালিক হয়েছে

বটে পুঁজিপতি। পণ্যের এই অপরিশোধিত অংশের মালিক হিসাবে পুঁজিপতি যা হাসিল করেছে তা হচ্ছে পুঁজি অর্থাৎ একটি পণ্য উৎপন্নে পণ্য মালিক যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োগ করেছে আর পণ্যটি বিক্রি করে মালিক যে পরিমাণ দাম পেয়েছে তা তার বিনিয়োজিত পুঁজির চেয়ে বেশী আর এই বেশী অংশই হচ্ছে নতুন গঠিত পুঁজি। অর্থাৎ স্থায়ী ও অস্থায়ী পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতি নতুন পুঁজি গঠন বা পুঞ্জিভূবন করেছে। কিন্তু, স্থায়ী পুঁজি হতে নয় বরং পুঁজি গঠিত হয়েছে অস্থায়ী পুঁজি হতে। অর্থাৎ অস্থায়ী পুঁজির হিস্যা হতে উৎপন্ন মূল্যের যে অংশের জন্য পণ্য মালিকের কোনো ব্যয় নাই তা হচ্ছে পুঁজি। কাজেই, পণ্যের যে অংশের জন্য কোনো ব্যয় করেনি অথচ পণ্যের ঐ অংশ তথা পণ্যটির অপরিশোধিত অংশের দাম যা হাসিল করছে পণ্য মালিক তাহাই পুঁজি অথবা, মজুর তার উদ্বৃত্ত-সময়ের শ্রমে পণ্যটিতে যে পরিমাণ মূল্য সংযোজিত করেছে সেই উদ্বৃত্ত-সময়ে সৃষ্ট মূল্য অর্থাৎ উদ্বৃত্ত-মূল্য হচ্ছে পুঁজি। সুতরং, **পুঁজি হচ্ছে মজুরের উদ্বৃত্ত-সময়ের শ্রমে উৎপন্ন মূল্য তথা উদ্বৃত্ত-মূল্য বা পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বা অপরিশোধিত শ্রম তাই, শ্রম শোষণের ফসল অর্থাৎ পুঁজি হচ্ছে মৃত শ্রম, তবে বেঁচে থাকে জীবন্ত শ্রম খেয়ে।**

সুতরাং, পুঁজিপতি হচ্ছে শোষক; আর মজুরেরা শোষিত। আবার, মজুরেরা উৎপন্ন করে পুঁজি আর পুঁজির মালিক হচ্ছে বটে পুঁজিপতি। কি ভয়ানক অন্যায় ! অতঃপর, মজুরদের যৌথ শ্রমে উৎপন্ন পুঁজির এরূপ ব্যক্তিমালিকানা পুঁজিপতিদের সৃষ্ট আইনে বৈধ হলেও কার্যত অযৌক্তিক, অন্যায় ও অন্যায্য।

উল্লেখ্য,পুঁজিপতি যতবার শ্রম শক্তি ক্রয় করবে,ততবার উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে সক্ষম হবে। অর্থাৎ পুঁজি তথা মৃত শ্রম পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত হলেই কেবলমাত্র জীবন্ত শ্রম শোষণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে সক্ষম হয়। ফলে, পুঁজিপতির পুঁজির অস্তিত্বই কেবল রক্ষিত হয় না,বরং পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে পুঁজি গঠিত হয় অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্ন হয়। অতঃপর, পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে পুঁজির পরিমাণও বাড়ে।

কিন্তু,পুঁজি যদি পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত না হয়, তখন তা অলস টাকা হিসাবে গণ্য হয়। অলস টাকা যেহেতু শ্রম শক্তি ক্রয়ে নিয়োজিত নয় তাই, জীবন্ত শ্রম শোষণ বা উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্নে অলস টাকা অক্ষম। কিন্তু, পুঁজিপতিকে জীবন ধারণ করা সহ স্থায়ী পুঁজির প্রতিষ্ঠানাদি সংরক্ষায় নৈমত্তিক নানান ব্যয় মিটাতে সঞ্চিত পুঁজি বা অলস টাকাই ব্যয় করতে হয়। ফলে,পুনরুৎপাদনের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন করতে না পারলে পুঁজিপতির টাকার পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। অর্থাৎ পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত না হলে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষিত হয় না তথা পুনরুৎপাদন ব্যতিত পুঁজিপতি তার

পুঁজি সংরক্ষায় সক্ষম নয় অর্থাৎ পুনরুৎপাদন ছাড়া পুঁজি তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে অক্ষম।

তাছাড়া, মুদ্রাস্ফীতি পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির অনুসংগ। তাই, মুদ্রাস্ফীতি জনিত কারণে সাধারণভাবে প্রতি বছরই মুদ্রামানের হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে থাকে। তাই, পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত না হওয়া অর্থ মুদ্রাস্ফীতির হারে দাম হারায়। ফলে,বছরান্তে, পুঁজিপতির পুনরুৎপাদনে অ-নিয়োজিত পুঁজি মুদ্রাস্ফীতির হারে কমে যায় এবং বছর বছর এভাবে কমতে কমতে পুনরুৎপাদনে অবিনিয়োজিত পুঁজি তার অস্তিত্ব হারায়।

কাজেই, পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় পুনরুৎপাদন অপরিহার্য। সতুরাং, পুনরুৎপাদন পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত।

পুঁজিপতিরা পুঁজির মালিক বলেই পুঁজিপতি। অর্থাৎ, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থায় বিনিময় ও উৎপাদনের উপায় সমূহের মালিক হিসাবে শ্রম শক্তি ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়কারী বলেই পুঁজিপতিরা পুঁজিপতি। তাই, পুঁজি থাকলেই পুঁজির মালিক হিসাবে পুঁজিপতিবিশেষ,একজন পুঁজিপতি।

কিন্তু,পুঁজিপতি বিশেষ যদি মজুরের শ্রম শোষণের সুযোগ হারায় তবে, শোষকের পরজীবিতার জীবন যাপনের সুযোগও হারায়।এক কথায় পুঁজি না থাকলে একদা পুঁজিপতি বিশেষ আর পুঁজিপতি নয়; আর পুঁজিপতি নয় বলেই একদা পুঁজিপতি তার পরজীবিতার জীবন-যাপনের সুযোগ-সুবিধা হারাতে বাধ্য এবং হারায় ।

তাই, পুঁজিপতি মাত্রই, তার পুঁজি সংরক্ষায় পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত পূরণে বাধ্য বলেই পুঁজিপতি মাত্রই পুঁজির গোলাম। সুতরাং, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজিপতিকে ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া করতে হয় যেমনটা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম সাধনকারী গোলাম বা ক্রীতদাসেরা প্রভুর হুকুম তামিলে করে থাকত। তাই, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজির গোলাম-পুঁজিপতিরা হত্যা সমেত যে কোন দুস্কর্ম সংঘটনে কুণ্ঠিত হয় না।

উল্লেখ্য, পণ্যের অর্থ মূল্যে রূপান্তর আর অর্থের পণ্য মূল্যে রূপান্তর অর্থাৎ **অর্থের পণ্যে আর পণ্যের অর্থে রূপান্তর প্রক্রিয়াটি হচ্ছে পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়া**। এই সঞ্চালন প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ও সচল না থাকলেও পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষিত হয় না। কারণ,পণ্য বিক্রি না হলে পণ্যের মালিকের নিকট ঐ পণ্যের দাম ফেরৎ আসে না। আর পণ্যের দাম যদি পণ্য মালিকের নিকট না আসে তবে, পণ্যটি উৎপন্নে যা ব্যয় হয়েছে তাও ফেরৎ আসবে না। তাছাড়া, পণ্যটি বিক্রি হলে পণ্যের যে অংশের জন্য পণ্যের মালিক কোন ব্যয় করেনি অর্থাৎ পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বাবতও পণ্যের মালিক কিছু পাবে না। অথচ,

পণ্যের অপরিশোধিত অংশ বাবত প্রাপ্ত মূল্য হচ্ছে উদ্বৃত্ত-মূল্য বা পুঁজি যা পণ্যের মালিক পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে হাসিল করে থাকে। কিন্তু, পণ্য বিক্রি না হলে কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য বা পুঁজি হাসিলের সুযোগই পণ্য মালিক হারায় না বরং পণ্যটি উৎপন্নে ব্যয়িত পুঁজিও পণ্য মালিককে হারাতে হয়। অর্থাৎ পণ্য বিশেষ বিক্রি হয়ে অর্থ মূল্যে রূপান্তরিত হতে না পারলে তা আবার পণ্য মূল্যে রূপান্তরিত হতে পারে না তথা মূল্য ধারণ করা সত্ত্বেও অবিক্রিত পণ্যটি মূল্যহীন। ফলে, অবিক্রিত পণ্যে বিনিয়োজিত পুঁজি অস্তিত্বহীন।

তাই,উৎপন্ন পণ্য বিক্রি হওয়াটা পণ্য মালিকের পুঁজি টিকে থাকার শর্ত। অর্থাৎ পণ্য, অর্থ মূল্যে রূপান্তরিত হয়ে আবার পণ্য মূল্যে রূপান্তরিত হওয়াটা হচ্ছে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত। বস্তুত,পুঁজির সঞ্চালন প্রক্রিয়ায় পুঁজি উৎপন্ন হয় না। কিন্তু,পুঁজির সঞ্চালন না হলেও পুঁজি হয় না।সুতরাং,পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষায় পুঁজির সঞ্চালন আরেকটি অপরিহার্য শর্ত।

প্রাক সামন্ততন্ত্র কালেও ক্ষুদ্র শিল্প ছিল কিন্তু,খুবই গুরুত্বহীন। তবে, সামন্ততন্ত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের মালিক, ছোট ছোট কারিগর, এমনকি মজুরি শ্রমিকেরা নিজেদেরেকে ছোট ছোট পুঁজিপতিতে এবং ক্রমান্বয়ে মজুরি শ্রম শোষণ ও তদানুরূপে সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে নিজেদেরকে পূর্ণ বিকশিত পুঁজিপতিতে রূপান্তরিত করেছিল। কিন্তু,স্বতন্ত্রভাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উৎপাদনের উপায়গুলির সামাজিকভাবে কেন্দ্রীভূত উপায়ে রূপান্তর,বহু সংখ্যক মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পত্তির অল্পসংখ্যক মানুষের বৃহৎ সম্পত্তিতে রূপান্তর, এবং জমি, জীবিকা ও শ্রমের উপায় থেকে বিপুল সংখ্যক মালিককে দখলচ্যুত করা তথা অনেকের স্বপোর্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হারানোর কষ্টকর, বেদনাদায়ক ও দুর্ভোগের ইতিহাস হচ্ছে পুঁজির ইতিহাসের উপক্রমণিকা তথা পুঁজির প্রারম্ভিক কাল বলে মার্কস তার পুঁজি গ্রন্থের ১ম ভাগ, দ্বিতীয় অংশ, অষ্টমভাগ, অধ্যায় ৩১ ও ৩২, এ বিবৃত করেছেন। যদিও পুঁজিতন্ত্রী সমাজের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁজিওয়ালাদের স্বোপার্জিত ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাকরণের মাধ্যমে পুঁজিতন্ত্রের বিকাশপর্ব শুরু হয়েছে।

অতঃপর, সামন্ত সমাজের ধ্বংসস্তুপ হতে উত্থিত তবে, ইটালী মূল উৎপত্তি স্থল হলেও পুঁজির বা পুঁজি উৎপন্নে আধুনিক কল-কারখানার আদি ভূমি হচ্ছে ইংল্যান্ড। ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, পোর্তুগাল ও স্পেন ইত্যাদি দেশেও আধুনিক কল-কারখানা গড়ে উঠে। কিন্তু, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই অর্থাৎ পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন শর্তেই পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার বিকাশে এই সব দেশেগুলোর জাতীয় সীমানা পর্যাপ্ত ছিল না। কারণ, পুনরুৎপাদিত পণ্য অর্থ মূল্যে রূপান্তিত হতে পণ্যের বাজার আবশ্যক। তাই, বাজারের আবশ্যকতায় পুঁজিপতি শ্রেণী

উপনিবেশিকতার নীতি গ্রহণ ও তা কার্যকর করে একের পর এক দেশই কেবল দখল করেনি বরং আমেরিকা যা ছিল আটলান্টিকের এ পাড়ের বাসিন্দাদের নিকট অজ্ঞাত তা সহ সমগ্র বিশ্বকে জয় করল; এবং প্রতিষ্ঠা করল দুনিয়াব্যাপী একই অর্থনীতি অর্থাৎ পণ্য উৎপন্ন ও পণ্য বেচা-কেনার অর্থনীতি তথা পুঁজিতন্ত্রী অর্থনীতি।অর্থাৎ, পণ্য উৎপাদন ও বেচা-কেনা, আবার পণ্য উৎপাদন ও বেচা-কেনা, আবার পণ্য উৎপাদন ও বেচা-কেনা তথা **পণ্য উৎপাদন ও বেচা-কেনার সমাজ বা বিপুল বা অগণন পণ্যের সমাজ হচ্ছে পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ**।
সুতরাং, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পণ্য বিক্রির নিমিত্তে তথা পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালন শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী বিশ্ববাজারের জালে দুনিয়ার সকল দেশকে জড়িয়ে নিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশ্বিক চরিত্র দান করেছে।তাই,পুঁজিতন্ত্র হচ্ছে একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা।**সুতরাং, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে একটি বৈশ্বিক সমাজ।**
উল্লেখ্য,প্রাক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থায়, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানসমূহ ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন, স্বয়ং নির্ভর স্থানীয় অর্থনীতি, তাও আবার প্রকৃতি নির্ভর এবং প্রধানত কৃষি ভিত্তিক তাই, খুবই দরিদ্র অর্থনীতি। তবে, দাসপ্রভু ও সামন্ত প্রভুদের রাজনীতি অর্থাৎ ধর্মের প্রবর্তক, রক্ষক ও সংরক্ষক; অজ্ঞতা, মূর্খতা, মূঢ়তার ও অন্ধত্ব এবং এসবের নানান জাতীয় প্রচারক; মিথ্যাচার, চালবাজি, ভন্ডামি ও প্রতারণাসমেত সকল দুস্কর্মের উৎস ব্যক্তিমালিকানার সুবিধাভোগী ও পাহারাদার; এবং হিংস্রতা,বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা ও অসভ্যতার মোড়ল- যুদ্ধবাজ রাজা-বাদশা, এবং খুন, অত্যাচার ও অনাচারের মাতুব্বর দাসপ্রভু ও সামন্ত প্রভুদের রাজত্ব ছিল বটে প্রাক পুঁজিতন্ত্র তথা স্বয়ং-নির্ভর স্থানীয় অর্থনীতি।
কিন্তু, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে বিপ্লবী পুঁজিপতি শ্রেণী উপনিবেশিকতার প্রগতিশীল নীতি অনুশীলন করে যুদ্ধ বিগ্রহ সমেত নানান দুস্কর্ম ও পণ্যের সস্তা দামের জোয়ারে সমগ্র পৃথিবীকে একটি মাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তথা পুঁজিতন্ত্রের আওতায় নিয়ে আসে। প্রাক পুঁজিতন্ত্রের শাসক-শোষক, সুবিধাভোগী শ্রেণী পরাজিত হয় বিপ্লবী পুঁজিপতিদের নিকট। তাই, পরাজিত শাসক শ্রেণীর রাজনীতি তথা ধর্মও পরাজিত হয়। বিপরীতে, পুঁজিতন্ত্র বিকাশে আবশ্যকীয় রাজনীতি তথা আধুনিক বুর্জোয়া শ্রেণীর গণতান্ত্রিক রাজনীতি এবং এই গণতান্ত্রিক রাজনীতির অপরিহার্য অংশ **ইহলৌকিকতার** (**সেক্যুলারিজম**) নীতি কার্যকর করে বিজয়ী বুর্জোয়ারা। অর্থাৎ **বিপ্লবী বুর্জোয়ারাই ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ও ধর্মকে পরাজিত করে কেবলই পুঁজির অস্থিত্বের শর্তে তথা পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের প্রয়োজনে।**

তাই,পুঁজি বিকাশের শর্তেই আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক বৈশ্বিক ব্যবস্থার পত্তনকারী পুঁজিতন্ত্রীরা তাদের হীনতম স্বার্থবোধে চালিত হয়ে যুদ্ধ-বিগ্রহ, হত্যা-খুন, ঘুষ-দুর্নীতি, চুক্তি ভংগ- প্রতারণা,জালিয়াতি-মিথ্যাচার, চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ইত্যকার নানান দুস্কর্ম করা সত্ত্বেও প্রাক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপনে তথা **সমাজ পরিবর্তনে ছিল বটে ইতিহাসের এক অচেতন হাতিয়ার।** তারা কেবল আগেকার দিনের রাজা-বাদশাদের মতো বিজয় বা দখলই করেনি দেশসমূহ বরং পাল্টিয়ে দিয়েছে সমগ্র পৃথিবীকে।নৈমত্তিক অভাব, অনটন, দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও চিকিৎসাহীনতা এবং জন্মকালীন মৃত্যুর বিভিষিকাময় মৃত্যুপুরি, অন্ধত্ব , অজ্ঞতা ও বিচ্ছিন্নতার অনঢ়-অচল বৃক্ষ সূলব জীবন ব্যবস্থার অতীতের অনুন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার স্থলে প্রতিষ্ঠিত হল পণ্যের প্রাচুর্যেভরা সদা কর্মচঞ্চল আধুনিক শিল্প ও যোগাযোগ এবং আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার এক আধুনিক সমাজ- পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ।

তবে, পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্ট **কৃত্রিম দারিদ্র** ও শোষণে জর্জরিত ও দুর্ভোগের শিকার মজুর শ্রেণীতো বটেই এমনকি সকল পুঁজিপতিও আধুনিকতার সুযোগ-সুবিধা সমভাবে লাভে ও ব্যবহারে সুযোগহীন বটে ব্যক্তিমালিকানা ভিত্তিক তাই বৈষম্যপূর্ণ এই পুঁজিতন্ত্রে।

বিশ্ব বাজারে সহজে ও কম সময়ে পণ্যের পরিবহন তথা পুঁজির দ্রুততম সময়ে সঞ্চালনের শর্তে পুঁজিপতি শ্রেণী বাধ্য হয়ে আধুনিক পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যাকিং ব্যবস্থা গড়ে তোলে। পণ্য যত কম সময়ে বাজারে যাবে এবং পণ্য বিক্রির অর্থ যত কম সময়ে পণ্যের মালিকের নিকট ফিরে আসবে তত কম সময়ের ব্যবধানে পুঁজিকে পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগ করা যাবে। আবার যত বেশী হারে পুঁজি পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত হবে তত বেশী হারে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হবে এবং যত বেশী হারে বা যত বেশী বার উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপন্ন হবে তত বেশী বার ও হারে পুঁজি বাড়তে থাকবে।

তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজি রক্ষা ও পুঁজি গঠন বা পূঞ্জীভূবনে তথা পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে উৎপন্ন পণ্য বিক্রির হার বাড়াতে বাধ্য। সে কারণেই, পুঁজিপতি শ্রেণী আধুনিক সড়ক-নৌ, রেল- বিমান পরিবহন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও প্রসার এবং উন্নততর অবকাঠামো ও প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধনে বাধ্য। কেবল ব্যাকিং ব্যবস্থার পত্তনই নয় বরং এর আধুনিকায়ন না করেও পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা ও পুঁজির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। তাই, মোবাইল ব্যাকিং ও নেট ইত্যকার বিষয় উদ্ভাবন ও উন্নতি বিধান করতেও বাধ্য হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী। একই কারণে, অর্থাৎ পুনরুৎপাদনের হার ও পরিমাণ বৃদ্ধি করে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা ও মোট পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণে উৎপাদনের

আয়তনের ও উদ্যোগসমূহের বিপুল সম্প্রসারণে, যা ছিল ভিন্ন ভিন্ন একক পুঁজির পক্ষে অসম্ভব তা সম্ভব করতে স্টক কোম্পানী বা শেয়ার বাজারের প্রতিষ্ঠাও করতে বাধ্য হয়েছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। যদিও,স্টক কোম্পানীতে কাজটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পুঁজির মালিকানা থেকে তাই, স্টক কোম্পানীতে বিনিয়োগকারী পুঁজিপতিরা যেমন পুঁজিপতি হিসাবে গুরুত্ব হারায় তেমন প্রত্যক্ষভাবেই সম্মিলিত ব্যক্তিদের পুঁজির সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে তা এক সামাজিক উদ্যোগ হিসাবে রূপ লাভ করে।ফলে, ব্যক্তি মালিকানার বিলোপন ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সুস্পষ্ট নির্দেশনা অর্থাৎ,পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-পদ্ধতির অভ্যন্তরেই পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিলোপ সাধন হল স্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ফাটকাবাজি, ঠগবাজি ও প্রতারণার আখড়া হলেও স্টক কোম্পনী গঠন ও তার কার্যক্রম ও ফলাফল বিষয়ে উপরোক্ত মূল্যায়নসমেত স্টক কোম্পানী গঠনকে **পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশের চূড়ান্ত অবস্থা** বলে বর্ণনা করেছেন মার্কস। পুঁজি, ইংরেজী তৃতীয় খন্ড, কলকাতা, ভারতের বাণী প্রকাশনীর প্রকাশিত ' ক্যাপিটাল' পঞ্চম খন্ড, সাতাশ অধ্যায়, ধনতান্ত্রিক উৎপাদনে ক্রেডিটের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪১৭-৪২৩।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের চূড়ান্ত অবস্থা মানে যুগপৎ পুঁজিতন্ত্রের পতনেরও সূচনা এবং সত্যি সত্যি পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই **স্টক কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিপতি শ্রেণী অচেতনভাবে ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ ও সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার কেবল সূচনাই নয় বরং ব্যক্তি মালিকানা বিনাশ ও বিলুপ্তির নজির সমেত তদানুরূপ বোধ ও চিন্তার ভিত ও শর্তাদি তৈরী করেছে।**

পণ্য উৎপন্নে আবশ্যকীয় উপাদান ও কাঁচামাল সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে এবং পণ্য বিপনন ব্যবস্থার ক্রমাগত অধিকতর উন্নতি সাধনে বাধ্য হয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী পৃথিবীর গঠন, বয়স, ওজন, ভর, আয়তন, ব্যাসার্ধ, গতি ইত্যাকার বিষয়াদিও জেনেছে । সূর্য সহ ইউনিভার্সের সৃষ্টি- বিকাশ বিষয়েও তথ্য-উপাত্ত উদ্ঘাটন ও সংগ্রহ করছে পুঁজিপতি শ্রেণী। পণ্য উৎপাদন ও বিপননের আধুনিক ব্যবস্থাপনার কারণে ও হেতুবাদেই বুর্জোয়া শ্রেণী পত্তন করে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা। প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত বিষয় এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের নানান শাখার পত্তন ও প্রসার সাধনে বাধ্য হয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির স্বার্থে ও শর্তে। জলীয়, খনিজ ও সৌর শক্তি ব্যবহার, পুনঃপুন ব্যবহার ও সাশ্রয়ী ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন ও বিপননের তথা পুনরুৎপাদন ও সঞ্চালনের শর্ত পূরণ করতেই এদ্বিষয়ক যাবতীয় আবিস্কার ও উদ্ভাবন করেছে পুঁজিপতি শ্রেণী। তবে, পুঁজি যেমন একক কোন ব্যক্তি

বিশেষের উৎপন্ন নয়, বরং মজুরদের যৌথ শ্রমে উৎপন্ন,তেমন কোন বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও উদ্ভাবনও একক কোন ব্যক্তি বিশেষের বিশেষ অবদান বা বিশেষ মস্তিষ্ক প্রসূত বিশেষ বিষয় নয় বরং, পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে সকল বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও উদ্ভাবন সংঘটিত হয়েছে বহুজনের সম্মিলিত ও অন্যোন্যনির্ভরতার পারস্পারিক ও পরস্পরার শ্রমে। যতবেশী বৈজ্ঞানিক আবিস্কার ও উদ্ভাবন ততবেশী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার। ফলে, সমাজ যেমন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য লাভ করে তেমন সমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনার প্রসার ও বিকাশ লাভ করে। তাইতো, মার্কস যেমন পুঁজির গোপন রহস্য ও সমাজ পরিবর্তনের নিয়ম আবিস্কার করে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কার করতে সক্ষম হলেন তেমন এটিও পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থায় নিশ্চিত হল যে পণ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় জড়িতরা সকলেই সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাইতো, মার্কস এটিও জানলেন ও জানালেন যে পণ্য উৎপাদনে **শ্রম সমতাবাদী** তাই, সম মূল্যে পণ্য বিনিময় হয়। অতঃপর, **প্রত্যেক মানুষ সমান**, যদিও মানুষে মানুষে বৈষম্য বিদ্যমান ব্যক্তিমালিকানার কারণে। আবার, এই বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া-কলাপের হেতুবাদেই ১৯৫৬ সালে জানা গেল প্রত্যেক মানুষ জন্ম সূত্রে সমান। অর্থাৎ দুই তরপের পার্টনারদের প্রত্যেক পক্ষের ২৩ টি করে মোট ২৩ জোড়া ক্রোমোজম হতে প্রত্যেক মানুষ সৃষ্ট। অতঃপর, মানুষে মানুষে বৈষম্যমুক্ত তাই প্রত্যেকেই সমান এমন মানুষদের মানবিক সমাজ- সমাজতন্ত্র বিষয়ক ধারণা, তত্ত্ব, সূত্র ইত্যকার বিষয়াদিও আবিস্কৃত, সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত হচ্ছে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থার বদৌলতে। তবে, প্রকৃতি বিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিদ্যমান সকল শাখার সূচনা ও বর্তমান পর্যায়ে উন্নীত করলেও পুঁজির স্বার্থ বৈ বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে না পুঁজিপতি শ্রেণী। তাই, কার্যত বিজ্ঞানের গতি রুদ্ধ ও অবরুদ্ধ পুঁজির শৃংখলে।অতঃপর, পুঁজিতন্ত্রে, বিজ্ঞানের অবাধ বিকাশ হচ্ছে না। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রে, অবাধ গতিতে অগ্রসর হতে পারছে না বিজ্ঞান। যদিও, পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে ও ফরমায়েশে সংঘটিত বৈজ্ঞানিক নানান গবেষণার ফলাফলের অচিন্তনীয় বহুমাত্রিক ফলাফলে এবং বৈজ্ঞানিক নানান ক্রিয়া-কলাপে বিজ্ঞানের নানান বিষয় উদ্বঘাটিত ও উদ্ভাবিত হচ্ছে যা স্বার্থান্ধ পুঁজিপতি চায়নি বা ভাবেনি, বা চায় না বা ক্ষেত্রবিশেষ বিরোধীতা করেছে বা গবেষণা লব্ধ সেসব ধরণের ফলাফলকে গোপন ও নিরুৎসাহিত বা নিষিদ্ধ করেছে। তৎসত্ত্বে, বিশ্বজনীন বিজ্ঞান এখনো পুঁজিপতিদের হাতে মজুরী দাসদের মতোই বন্দী। যদিচ, মজুর শ্রেণী পুঁজিপতি শ্রেণীর সৃষ্টি আর বিজ্ঞানও এই শ্রেণীরই উদ্ভাবন ।তবে,এই দুটোর মিলনে অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী বিজ্ঞানের বোধে সজ্জিত,

শানিত ও সংগঠিত হলে স্বীয় স্রষ্টা পুঁজিপতি শ্রেণীকে দুনিয়া হতে বিদায় করবে।

উল্লেখ্য, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ ও শাসনের সূচনা হতে শোষক ও শাসক কর্তৃক অবশিষ্টদের শোষণ ও শাসন করাকে গ্রাহ্যতা, ন্যয্যাতা ও বৈধতা প্রদানে মতলববাজ-ধান্ধাবাজ ও পরজীবী শোষক-শাসকদের বদ উদ্দেশ্যজাত এবং মস্তিষ্কপ্রসূত বানোয়াটি গাল-গল্পাদি আইডিয়োলজি বা মতাদর্শ হিসেবে এখনো কেবল পরিচিতই নয় বরং ইত্যবসরে নৈরাজ্যবাদ, লেনিনবাদ সমেত নানান মতাদর্শ সৃজিত, চালু ও কার্যকর আছে। যেমন দৃশ্যত পৃথিবী স্থির অথচ,পৃথিবী ঘুরে সূর্যের চারিদিকে তাই ওরা পৃথিবীর গতি-প্রকৃতি না জেনেও বা তদ্বিষয়ে তাদের মতামত সঠিক তেমনটা নিশ্চিত না হয়েও কেবলই রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে নিখুঁত সত্যবাদীর পোষাকে আবৃত হয়ে পৃথিবীকে স্থির গণ্যে জিওসেন্ট্রিজিমের মতবাদ বা মানব দেহের নানান অংগ-প্রত্যংগ বিশেষত গ্ল্যান্ড সহ অভ্যন্তরীণ অংগগুলোর ও সেইসবগুলোর ক্রিয়া-কলাপ বা রক্ত, হরমোন বা ক্রোমোজম ইত্যাদি ইত্যাদির ক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কে জানা-বুঝার সুযোগহীন হওয়া সত্ত্বেও এবং সন্তান জন্মে নারী-পুরুষ উভয়ের সম অংশীদারীত্ব থাকলেও তা না জেনেই তথা সত্য নয় জেনে অর্থাৎ তদ্বিষয়ে অজ্ঞ হয়েও বিজ্ঞের মতো কেবলমাত্র রাজনৈতিক মতলবে দৃশ্যমান বিষয় ভিত্তিক ধারণা ও মিথ্যার উপর ভর করে তবে নারীকে স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি সাবস্তে বৈধ উত্তরাধিকারের জন্মদানের হাতিয়ার গণ্যে কেবলমাত্র পুরুষের বীর্য হতে সন্তানের জন্মরূপ মতবাদ সৃজন করে সন্তানের প্রতি অধিকার, অভিভাবকত্ব ইত্যাদি পিতার উপর আরোপ করেছে; ফলে সন্তান উৎপাদনে সমঅংশীদার হয়েও মা কেবল এসব থেকে বঞ্চিতই হয় নি বরং এই সব অসত্য মতবাদের ভিত্তিতে এসবে অযোগ্য ও অস্বীকৃত হয়েছে।

অথবা, ১৮৩৯ সালে কোষ তত্ত্ব আবিস্কারের পূর্বে কারো জানার সুযোগ ছিল না, এবং জানতোও না যে, বিলিয়ন বিলিয়ন কোষের সমন্বয়ে মানব দেহ গঠিত বলে মানব দেহে বিলিয়ন বিলিয়ন প্রাণ বা জীব সত্ত্বা বিদ্যমান। কারণ, প্রতিটি কোষই প্রাণ সম্পন্ন বলেই প্রতিটি কোষই স্বক্রিয়, সচল, রূপান্তরিত ও পুনর্নবীকৃত হয়। অথচ, মানুষকে কেবল একটি মাত্র প্রাণ সম্পন্ন প্রাণী হিসাবে চিহ্নিত ও নির্ণিত করে প্রশ্নের অতীত সত্য মর্মে অথচ, রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে বানোয়াটিমূলে তৈরী হয়েছে নানান মতবাদ। অথবা, "এইছ ২ ও", পানির এই সূত্র আবিস্কারের পূর্বে তা জানা-বুঝার সুযোগহীন সত্ত্বেও তথাকথিত 'আকাশ' (আকাশ বলে কিছু নাই যা আছে তা স্পেস) হতে পানির উদ্ভব রূপ বানোয়াটি কাহানী বা শূন্যতে বরফ এবং ১০০ ডিগ্রিতে পানি বাস্পে

পরিণত হয় এমন সূত্রায়ন হওয়ার আগে তা জানা-বুঝার সুযোগহীন তাই এসব সূত্র না জেনেই বরফ বা বাস্প বিষয়ে মহা জ্ঞানী দাবীদার গয়রহ নানান মতবাদ সৃজন করেছে,যা মতবাদ হওয়ার কারণেই ভূয়া, অসত্য ও মিথ্যা। অথবা, লেনিননবাদ হচ্ছে সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ এমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যজাত বিবৃতিগুলো হচ্ছে মতবাদ বা মতাদর্শ, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। কারণ, এসব মতাদর্শের স্রষ্টারা মতাদর্শীয় মূলে নানান ধরণের মহা জ্ঞানী, মহা বিজ্ঞ ও মহান ব্যক্তি ঠিক লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিন, মাও প্রমূখদের সর্ম্পকে যেমন দাবী করে থাকে যুগপৎ চরম প্রভুত্ব বা স্বৈরতান্ত্রিক ও দাসোচিত মানসিকতায় ভরপুর লেনিননবাদী পার্টিগুলো। তাই, কোনো প্রকার প্রশ্ন বা সন্দেহ নয় বরং কথিত মহা মানবদের আসলে শোষক পরজীবীদের সেবক, পাহারাদার তাই ধান্ধাবাজ, দুরন্ধর, চালবাজ ও ভন্ড তবে নেতা ও গুরু বিশেষদের বাণী বা মতবাদ কেবল বিশ্বাস করতে হয় দাসোচিত মানসিকতায়।

কিন্তু, পুনঃপুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যালোচনা ও প্রমাণ এবং পুনঃপুন প্রমাণ ব্যতিত বিজ্ঞান কোনো কিছু কবুল করে না, তাই বিজ্ঞানীরা অপ্রমাণিত কিছু বিজ্ঞান বলে গ্রহণ করে না। অতঃপর, বিজ্ঞান হচ্ছে প্রমাণিত সত্য আর মতাদর্শ হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধ তাই, প্রশ্নের অতীত বলে গোঁড়ামিপূর্ণ। কিন্ত, প্রমাণিত সত্য তথা বিজ্ঞান হচ্ছে কেবল আলো নয়, বরং প্রতিনিয়ত প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষার মান দন্ডে প্রমাণিত হতে এবং প্রমাণের ভিত্তিতে যুক্তিপূর্ণ জবাবে সক্ষম । মতাদশীরা অন্ধ, গোঁড়া বলে যুক্তির ধার ধারে না, বরং অসত্য ও মিথ্যার উপর ভিত্তি করে সংকীর্ণ স্বার্থে রচিত বলে স্বার্থান্বেষী ভন্ড মতাদর্শীরা যেমন মিথ্যা বলে তেমন পরজীবীতার সংকীর্ণ স্বার্থ রক্ষার অপচেষ্টায় যে কোনো মিথ্যা বলতে দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করে না। মূলত, মতাদর্শ হচ্ছে দৃশ্যমান বিষয় নির্ভর তবে ভাব বা কল্পনাশ্রয়ী। তবে, বিমোহিত, সম্মোহিত ও বিভ্রান্তিকরণে এখনো কার্যকরী বটে মতাদর্শ। কিন্তু, বিজ্ঞান হচ্ছে বস্তুগত বিষয়াদির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বস্তুর গঠন-পরিবর্তন বা রূপান্তরের কোড বা নিয়ম। তাই, বিজ্ঞানে ভাব বা কল্পনা বিলাসীতা বা অসত্যের যেমন সুযোগ নাই, তেমন বিজ্ঞান হচ্ছে সত্য তথা সার্বজনীন সত্য সুতরাং, সত্য বৈ মিথ্যা বলার সুযোগহীন হচ্ছে বিজ্ঞানী। সন্দেহ নাই, অন্ধত্ব ও হীনমন্যতার দাসোচিত মানসিকতায় নিমজ্জনে ও নিপতনে মতাদর্শ কার্যকরী, কিন্তু বিজ্ঞান সকল প্রকার অন্ধত্ব ও দাসোচিত মানসিকতার বিরুদ্ধে কেবল বিদ্রোহ নয় বরং স্বাধীন ও মুক্ত মানুষদের মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় । অতঃপর, জাতীয়তাবাদ, বর্ণবাদ, লেনিননবাদ, নৈরাজ্যবাদ ইত্যকার যত

ধরণের মতাদর্শের সৃজন, প্রচলন বা অতীতের মতাদর্শের সমূহের নিকট যতই আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী তাতে বুর্জোয়ারা কেবল অন্ধ বা একচোখা হওয়া বৈ যেমন টিকে থাকবে না তেমন নিজেদের অস্থিত্বের শর্তেই ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার হিসাবে বিজ্ঞানী সমেত বৈজ্ঞানিক সমাজ তথা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সকল বৈজ্ঞানিক শর্ত ও ভিত্তি তৈরী করছে।অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্র নিজেই স্বীয় বিলোপনের বীজ উৎপন্ন করছে। তাই, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজই হচ্ছে শোষক ও শাসকদের শেষ ও চূড়ান্ত তথা ইতিহাসের শেষ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ। কাজেই, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সাথে সাথে বিলুপ্ত ও সমাপ্ত হবে লেনিনবাদ সমেত সকল প্রকার মতাদর্শ। সুতরাং, **সকল প্রকার মতাদর্শহীন সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।** তাই, **সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ, বিজ্ঞানীদের সমাজ, এবং বিজ্ঞানের অবাধ গতির সমাজ।**

পণ্য মালিকের লক্ষ্য হচ্ছে পণ্য বিক্রি করা; এবং বিক্রিত পণ্যের অর্থের অংশ বিশেষ তথা পুঞ্জীভূত পুঁজির একাংশ ব্যক্তিগত ভাবে খরচ করে বাকী অংশ পুনরুৎপাদনে বিনিয়োগ করে মজুরের শ্রম শোষণ করে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করা ও নতুন পুঁজি উৎপন্ন এবং পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে পুঁজিপতি হিসাবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা । তাই, পণ্যের ক্রেতার জাত, বর্ণ, ধর্ম, গোত্র, ভাষা, লিংগ , দেশ ইত্যাকার বিষয়াদি খোঁজার বা বিবেচনা করার আবশ্যকতা নাই পণ্যের মালিকের, বরং জাত-ধর্ম, গোত্র-বর্ণ, বা লিংগ নির্বিশেষে যেই ক্রয় করতে চায় পণ্যের মালিক তার নিকটই পণ্য বিক্রি করে। আবার পণ্যের ক্রেতারও সুযোগ নাই পণ্যের মালিক বা পণ্য উৎপন্নকারীদের জাত, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, লিংগ, দেশ ইত্যাদি বিবেচনা করার। বরং পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়পক্ষ পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে প্রাকৃতিক নিয়মের মতোই এক নিয়ম তথা বিশ্ববাজারের অধীন এবং পণ্য বিক্রেতারাই দেশ-জাতির গন্ডী-বোধ কার্যত মাড়িয়ে-ভেংগে চুরমার করে পণ্যের বিশ্ববাজার তথা পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। তবুও, বিশ্ব বাজারে প্রতিযোগিতায় অক্ষম পণ্য বিক্রেতা গয়রহ তাদের পণ্যকে দেশ, জাতি বা ধর্মের আবেগ-অনুভূতির মোড়ক পরিয়ে কার্যত দেশ-জাতি বা ধর্মীয় বোধ-আবেগ ও অনুভূতিকে বিক্রি করে নিজ নিজ পণ্যের বিক্রির স্থানীয় বাজার বাড়াতে তৎপর। আবার, পুঁজি, পুঁজির মালিকানা, পুঁজির শোষণ ইত্যাকার বিষয়ে মজুর শ্রেণীকে বিভ্রান্ত ও মোহাচ্ছন্ন করে বুর্জোয়া সমাজের শ্রেণী বিভাজন এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণমূলক চরিত্র আড়াল ও গোপন করে শোষিত মজুরের জন্ম শর্তে শ্রেণী শত্রু হওয়া সত্ত্বেও শোষক বুর্জোয়াদেরকে শোষিত মজুরদের মেকি বন্ধু-ভাই সাজাতে এইসব দেশ-জাতি বা ধর্ম-বর্ণ বা লিংগ ইত্যাদির রাজনৈতিক আবেগ-বোধ ও

অনুভূতি বা প্রেম -মোহ বিশেষ মাদকের মতো বেশ কার্যকর। তাই, দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ভাষা প্রেম বা ধর্ম প্রেম ইত্যকার নানান প্রেমের মাদুলি ও মাদক বিক্রি ও তদানুরুপ রাজনৈতিক বুলি আওড়াতে রাজনীতিক, কবি, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্রকার, নাট্যকার, গীতিকার, শিল্পী প্রমুখদের ভাড়া করে কাজে লাগায় বুর্জোয়ারা।

যদি, এককভাবে কোনো দেশে আবশ্যকীয় সব ধরণের পণ্য উৎপন্ন করে কেবলমাত্র উৎপন্নকারী দেশের অভ্যান্তরীণ বাজারেই উৎপাদিত সকল পণ্য বিক্রি করা যেত তবে আর পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন প্রণালীকে বৈশ্বিক চরিত্র প্রদানে অত্তোসব যুদ্ধ-বিগ্রহ সমেত নানান দুস্কর্ম করতে হত না বুর্জোয়াদেরকে। তাই, খোদ বুর্জোয়ারাই বিশ্ব বাজারের স্রষ্টা এবং সকলেই বিশ্ববাজারের অধীন হওয়া সত্ত্বে দেশ-জাতি বা ধর্ম-বর্ণ বা লিংগ ইত্যকারের বোধ-আবেগ বা অনুভূতির রাজনীতি- মজুরদের জন্যতো ভয়ংকর ক্ষতিকর এবং মন্দতো বটেই তবে, বুর্জোয়াদেরও কেবল দ্বিচারিতা নয় বরং দেউলিয়াপনা ও নিকৃষ্টতম মিথ্যাচারে ভরপুর ভন্ডামির কুৎসিৎ হাতিয়ার ও নজির।

তবে, প্রকৃতপক্ষে কোনো পণ্যই জাত-জাতি বা ধর্ম-বর্ণ বা ভাষা-লিংগ বা দেশ বিশেষের উৎপন্ন নয় বরং পণ্য উৎপন্ন করে মজুর । আবার মজুরও কোনো জাত-জাতি বা ধর্ম-বর্ণ বা ভাষা-লিংগ বা দেশের উৎপন্ন নয় বরং পণ্য উৎপাদনের জন্য মজুর শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে পুঁজিপতি শ্রেণী, যে শ্রেণী বিশ্ব দখল করে বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর পত্তন ও বিকাশ সাধন করে হালে হাজারো সংকট ও সমস্যা সমেত এবং সমাজ শাসনে অযোগ্যতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও টিকে আছে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের রক্ষণা-বেক্ষণে আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংস্থা গঠন ও বহু রাষ্ট্র ও বহু রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা এবং অতিতের তথা পরাজিত রাজনীতি ও রাজনৈতিক শক্তি সমেত নানান প্রকারের লাখ লাখ সংস্থা-সংগঠন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও চালু করে পুঁজিতন্ত্রের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যয় ভয়ানকরকমের বাড়িয়ে। তাই, স্থানীয় বা জাতীয় নয় বরং পুঁজিপতি শ্রেণীও বটে এক বৈশ্বিক শ্রেণী। আবার, মজুর তার নিজস্ব পণ্য- শ্রম শক্তি বিক্রি করার সময় ক্রেতার জাত, বর্ণ, গোত্র, ধর্ম, ভাষা, লিংগ, দেশ ইত্যাদি খোঁজার বা বাচ-বিচার করার অবকাশ নাই। বরং পুঁজিপতিদের পণ্যের মতো মজুরও তার পণ্য-শ্রম শক্তি বিক্রির জন্য বিশ্বের যেখানে বাজার তথা ক্রেতা পায় সেখানে গমন করে। কেউ কেউ অবৈধভাবেতো বটেই এমনকি, মৃত্যুর ঝুঁকি আছে জেনেও তারা যাতায়াত করে এবং যাতায়াতকালে মৃত্যুও বরণ করে পাহাড়ে, জংগলে ও জলে ।

ফলে, পণ্য বিক্রেতা হিসাবে মজুর ও পুঁজিপতি এই উভয় শ্রেণী ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে বিশ্ববাজারের অধীন। তাই, তাদের পণ্যের ক্রেতার জাত-জাতি বা ধর্ম-বর্ণ, বা ভাষা -লিংগ বা দেশ ইত্যকার রাজনৈতিক পরিচয় দেখার অবকাশ নাই। তাই, জাতিপ্রেম, দেশপ্রেম,ধর্ম প্রেম, ভাষা প্রেম, বর্ণপ্রেম বা লিংগ প্রেম ইত্যকার রাজনীতির সত্যিকার প্রেমিক হলে মজুর বা পুঁজিপতি কেউই নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম নয় ।অর্থাৎ, পণ্যের ক্রেতা-বিক্রেতা কেহই পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না বলেই উভয় শ্রেণীর কেউ প্রকৃতপক্ষে দেশপ্রেমিক হতে পারে না, জাত-জাতি বা বর্ণ প্রেমিকতো নয়ই। তবু, ভন্ড বুর্জোয়ারা দেশ প্রেম, জাতি প্রেম, ভাষা প্রেম, বর্ণপ্রেম বা ধর্ম প্রেমের ভান করে।

প্রকৃতপক্ষে, পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কারী কেহই প্রকৃত অর্থে দেশপ্রেম সহ উল্লেখিত কোনো ধরনের প্রেমের প্রকৃত প্রেমিক নয় বলেই তারা এখনো বেঁচে বর্তে আছে। কাজেই, জাতি প্রেম সহ এসব কথিত প্রেমের রাজনীতি কেবলই উদ্দেশ্যমূলক মিথ্যাচার, ভন্ডামি ও ধান্ধাবাজি ছাড়া কিছুই নয়। তবে, লিংগপ্রেম (তথাকথিত নারী মুক্তির দাবীকৃত আন্দোলন যা- নারীকে ‘ মানুষ’ গণ্য না করে বরং শোষকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে প্রদত্ত রাজনৈতিক পরিচয়ে পরিচয়কৃত নারীর সকল প্রকার দুর্ভোগ ও দুদর্শার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও বুর্জোয়া শ্রেণীকে দায়-দোষী করে নয়, বরং মজুরি দাসত্ব অব্যাহত রেখে কেবল পুরুষকে কৃত্রিমভাবে নারীর শত্রু গণ্যে তথাকথিত নারী মুক্তি বা নারীর ক্ষমতায়ন অর্থাৎ নারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জনের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে নারীকে মানুষ নয় বরং নারী হিসাবেই অক্ষুন্ন রেখে ব্যক্তিগত সম্পত্তির বলে বলীয়ান করা। অথচ, রাজনৈতিক মতলবে মানুষের একাংশকে অতি মূল্যায়িত করে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাধর পুরুষ এবং আর একাংশকে পুরুষের সম্পত্তি গণ্যে দুর্বল-অক্ষম নারী হিসাবে রাজনৈতিকভাবে উপস্থাপন করা সহ নারীদের যাবতীয় অবমূল্যায়ন ও অমর্যাদার কারণ সহ দুনিয়ার তাবৎ দুস্কর্মের কারণ, উৎস ও ভান্ডার হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

উল্লেখ্য, চন্দ্র, সূর্য বা পৃথিবীর নামকরণ যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তেমন রমনের জন্য রমনী বা কামের বস্তু বলে কামিনী বা সম্ভোগের জন্য নারী এবং রমনকারী বা কামুক বা সম্ভোগকারী হচ্ছে পুরুষ এমন অসভ্য-বর্বর বোধ সমেত মানুষকে নারী ও পুরুষ বা হিজড়া তথা লিংগের ভিত্তিতে চিহ্নিত, গণ্য ও বিভক্ত করা হয়েছে রাজনৈতিক অসৎ উদ্দেশ্যে। অথচ, লিংগ সমগ্র দেহ নয় বরং দেশের অংশ বিশেষ মাত্র এবং লিংগ বিশেষ দেহকে নিয়ন্ত্রণকারীও নয় তাই, রাজনৈতিক মতলব বৈ লিংগ বিশেষ মানুষের

পরিচিতির মানদন্ড হতে পারে না।সুতরাং,তৃতীয় লিংগের মানুষ সহ নারী বা পুরুষ সকলেই কেউ প্রকৃতার্থে পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ নয় বরং শোষকদের রাজনীতির আবরণে আবৃত রাজনৈতিক সত্ত্বা বিশেষ মাত্র) সহ এসব নানান প্রেমের রাজনীতি এখনো মজুরদেরকে বিমোহিত, আচ্ছন্ন, বিভ্রান্ত, বিভক্ত করতে এক কার্যকরী বিষাক্ত টনিক বিশেষ।

তাইতো, দুনিয়ার মজুরদেরকে দেশ-জাতি, ভাষা-লিংগ, ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদিতে ভাগ-বিভাগ, বন্দি-বিচ্ছিন্ন এবং এই সব বোধে আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করতে মিথ্যাচারে ওস্তাদ ভন্ড-নির্লজ্জ পুঁজিপতি শ্রেণী এই সব রাজনীতির লালন-পালন ও পরিপোষণ করছে কেবলই টিকে থাকতে।

তবু, পণ্য বেচা-কেনার মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাই, জাত-জাতির সংকীর্ণতা যেমন বিলীন করছে তেমনি ধর্ম-বর্ণ, লিংগ, ভাষা, দেশ ইত্যকার রাজনৈতিক বোধ ও বিষয়াদিকে ক্রমান্বয়ে বিলীন ও বিলোপ করার কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, দুনিয়ার সকলেই উল্লেখিত রাজনৈতিক পরিচয় বিমুক্ত মানুষ এবং মানুষ হিসাবে প্রত্যেকেই একই মানবজাতির সমগুরুত্বপূর্ণ সদস্য এইরূপ বোধ-চিন্তা, চেতনার জন্ম দিচ্ছে ও প্রসার ঘটাচ্ছে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা। অতঃপর, মানুষে মানুষে সমতা বিষয়ক বোধ-চিন্তা ইত্যাদির প্রসার ও বিকাশের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকেই সমান মানুষ এই বোধ-চিন্তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হবে। সুতরাং, **সমাজতান্ত্রিক বোধ ও চিন্তার জন্ম দিচ্ছে পুঁজিতন্ত্র**।

সমাজতান্ত্রিক বোধ-চিন্তা ও চেতনার তত্ত্বায়ন-সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিকভাবে করেছেন মার্কস ও এ্যাংগেলস। কার্যত, পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিষয়ে মার্কস-এ্যাংগেলসের তত্ত্বায়ন, সূত্রায়ন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থার ফসল।

দাস প্রভু ও সামন্ত প্রভুদের সংকীর্ণ স্বার্থে মানবজাতির এক বিশাল অংশকে বন্য জন্তু-জানোয়ারের অধম গণ্যে শোষক প্রভু শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের দাসত্ববোধে সমাজকে প্ররোচিতকরণে ও নেতৃত্বপ্রদানে এক দংগল নেতা-গুরু তথা রাজনীতিকের আবশ্যকতার ধারণা প্রস্তুত ও প্রবর্তনকারী কতিপয় পরজীবী ব্যক্তিকে অসাধারণ এবং বাকীদেরকে সাধারণ সাবস্তে কথিত অসাধারণদেরকে তথাকথিত মহামানব, মহান নেতা, মহা গুরু বা কালজয়ী বুদ্ধিজীবী সাজিয়ে তাদের ভুয়া ক্ষমতা ও ফালতু গুরুত্ব জাহির করে যেসব বানোয়াটি গাল-গল্প তৈরী করিয়েছিল দাস ও সামন্ত প্রভুরা বা রাজা-বাদশাহরা সেইসব গাল-গল্পের অসারতা প্রমাণ করেছে কিন্তু পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা। কারণ, পণ্য বিশেষ কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, বরং মজুরদের যৌথ

শ্রমে উৎপন্ন হয় এবং পণ্য উৎপাদনী প্রক্রিয়ায় যুক্ত-জড়িতরা কেউই কমগুরুত্বপূর্ণ নয়। আবার দেহ যে মস্তিষ্কবিযুক্ত নয় তাই শ্রমকে বুদ্ধিবিযুক্ত নিছক দৈহিক খাটুনি হিসাবে চিহ্নিত করাও যে বিজ্ঞান সম্মত নয়, বরং দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে তথা শ্রম শক্তির ক্রিয়া অর্থাৎ শ্রমে মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তথা চিন্তা অর্থাৎ বুদ্ধির সংযুক্তি ও সম্পৃক্তি আছে তাও প্রমাণ করেছে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা।অর্থাৎ মনুষ্য শ্রমে চিন্তা বা বুদ্ধি অংশীদার বটে। তাই, শ্রমিকেরাও বুদ্ধি সম্পন্ন এবং চিন্তাশীল মানুষ। অতঃপর, কথিত পন্ডিত তথা পরজীবিতার ভাগীদার মাথা মোটা, বই পড়ুয়া ও বই নির্ভর এবং বাস্তব নয় বরং বই হতে যেকোনো সমস্যার সমাধান সন্ধানী বুদ্ধিজীবীরা মানবদেহতো বটেই এমনকি, অনূন্য 'শ্রম' বিষয়েও কেবল অজ্ঞতাই প্রকাশ করে না বরং মিথ্যাচার ও ভন্ডামির দায়-দোষ মুক্ত নয়।

সুতরাং, ম্যানুয়েল লেবর বলে আধুনিক শিল্পের যুগেও যে, শিল্প শ্রমিকদেরকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করার অলিখিত বিধি চালু আছে, তাও বাতিল করছে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা। অন্যদিকে প্রাতিষ্ঠানিক সনদধারী তবে আধুনিক শিক্ষা, চিকিৎসা,সাংবাদিকতা সহ নানান পেশায় নিযুক্তব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উৎপাদনশীল কাজে তথা পুঁজি গঠনে, পণ্য উৎপন্নে তাদের শ্রম শক্তি বিক্রি করে বলে তারাও শ্রমিক হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে ভুয়াভাবে বুদ্ধিজীবী হিসাবে আখ্যায়িত করে কথিত অভিজাত বর্গীয় গণ্যে শ্রমিক শ্রেণী হতে তাদেরকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করার অপপ্রয়াশ এখনো জারী থাকলেও কার্যত, পণ্য উৎপাদন ও বিনিময় প্রক্রিয়ায় শ্রম শক্তির বিক্রেতামাত্রই যে শ্রমিক বা মজুর তথা মজুরি দাস তাও নিশ্চিত করছে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাই।

অতঃপর, কথিত মহামানব, নেতা, গুরু, গাইড ইত্যকার পদ-পদবীধারী পরজীবীগোষ্ঠীর কেবল অপ্রয়োজনীয়তাই নয় বরং সমাজে তাদের উপস্থিতি যে ক্ষতিকর তাও প্রমাণ করছে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা। বুর্জোয়ারা 'বুর্জোয়া গণতন্ত্রের' প্রবর্তন করলেও নেতা, উপনেতা বা পাতি নেতা এবং বুদ্ধিজীবী ইত্যকার ধারণা বিলোপ করেনি।

কারণ, বুর্জোয়ারাও শোষক-পরজীবী এবং বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তি বটে ব্যক্তিমালিকানা- যা হতে ঐ সব বর্বর, অসভ্য, অসত্য ও মানবজাতির জন্য ভয়ানক অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর ধারণাসমূহের উদ্ভব। সত্যি সত্যি, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ ও শাসনের মতো অন্যায়, অবমাননাকর ও অমর্যাদাকর আর কিছু হতে পারে না।

উল্লেখ্য, ব্যক্তিমালিকানাধীন জন্তু-জানোয়ারের দেখ-ভাল করার জন্য রাখাল আবশ্যক। কিন্তু বন্য জন্তু-জানোয়ার যাদের কোন মালিক নাই, তাদের দেখ-ভাল করার জন্যতো কোন রাখাল লাগে না। অথচ, বন্য জন্তু-জানোয়ারতো তাদের নিজ নিজ বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারাই তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে, প্রতিপক্ষ প্রাণীদের হামলা-আক্রমণ হতে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবেলা করেই বেঁচে থাকে। যদিচ, বেঁচে থাকার উপায়াদির সংরক্ষণতো নয়ই এমনকি, বন্য জন্তুরা তাদের খাদ্যও এখনো উৎপন্ন করতে পারে না।

অথচ, খাদ্য-পানীয় উৎপন্ন ও সংরক্ষণে যোগ্য এবং অত্যাধুনিক বসতি নির্মাণসহ নানান স্থানে এমনকি, বায়ুপথেও গমনাগমনে সক্ষম তদপুরি, আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারকারী মানব জাতির এক বিরাট অংশ নাকি কতিপয় শাসকের শাসন, কতিপয় বুদ্ধিজীবীর কথিত বুদ্ধি, কতিপয় নেতার নেতৃত্ব, কতিপয় গুরুর কথিত শিক্ষা বা কতিপয় গাইডের নির্দেশনা ব্যতিত জীবন ধারণে অক্ষম, এর থেকে লজ্জাস্কর ও গ্লানিকর বিষয় আর কি হতে পারে। তবে, পণ্য উৎপাদনের অন্যোন্যনির্ভরতার সম্পর্কের কারণেই পণ্য উৎপাদনী কাজে জড়িতরা কেউ নয় নেতা বা গুরু বা গাইড বরং প্রত্যেকেই সমান গুরুত্বপূর্ণ এমনকি গেইটম্যানও নয় কম গুরত্বপূর্ণ। অতঃপর, গুরু, গাইড বা নেতা ইত্যকার পরজীবীদের উপযোগিতা বিষয়ক অযৌক্তিক, ক্ষতিকর, লজ্জাস্কর ধারণা এবং মতবাদিতা হতে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজনীয় উপাদান সমেত আবশ্যকীয় বোধ-বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনার নিয়ত জন্ম দিচ্ছে পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা।

কাজেই, অজস্র পণ্যের সমাজ-পুঁজিতন্ত্রী সমাজ কেবল নিজেই নিজের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল নয় বরং মানুষে মানুষে বৈষম্য-বৈরীতামুক্ত তথা নেতা-গুরু, গাইড-বুদ্ধিজীবী ইত্যকার পরজীবী মুক্ত তথা মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসন-শোষণ মুক্ত, অর্থাৎ রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল সমেত দমন-পীড়ন, শোষণ ও পরজীবিতার সকল সংগঠন মুক্ত অর্থাৎ , শ্রেণীমুক্ত এক অবিভক্ত-অভিন্ন তথা একটি একক মানব জাতির মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার বোধ-বুদ্ধি, এবং চিন্তা-চেতনার জন্ম দিয়ে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, যে পণ্যে শ্রম যত কম নিষিক্ত হয়, সে পণ্যের দাম তত কম হয়, তত কম দামে পণ্যটি বিক্রি করা যায়। আবার, যত কম দামে পণ্য বেচা যায় তত বেশী পণ্য বিক্রি হয়। যত বেশী পণ্য বিক্রি হয় তত বেশী পুঁজি পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত হয়। যত বেশী পুঁজি পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত হয় তত বেশী পুঁজি উৎপন্ন হয় তথা পুঁজির পরিমাণ ততবেশী বাড়ে। অতঃপর, পুঁজির অস্তিত্ব

রক্ষা ও পুঁজির পরিমাণ বাড়াতে পুঁজিপতিরা যত কম দামে সম্ভব পণ্য বিক্রির প্রতিযোগিতায় অনিচ্ছাকৃতভাবে লিপ্ত। এই প্রতিযোগিতায় যে হারবে সে কেবল বাজার হারাবে তাই নয়, বরং পুঁজিও হারাবে, ফলে পুঁজিপতি হিসাবে নিজের অস্তিত্বও হারাবে।ফলে, সে শোষণ করার সুযোগ হারাবে। অতঃপর, শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ভোগ ও দুর্দশাপূর্ণ জীবনই বরণ করতে হয়, প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া পণ্য মালিক তথা পুঁজিপতিকে। একবার যে শোষণের সুযোগ পায় সে আর তা হারাতে চায় না। কারণ, শোষণের সুযোগ হারানোর পরিণতি তার অজানা নয়। তাই, প্রতিযোগিতার ইচ্ছা থাক বা না থাক, পণ্য বিক্রেতা পণ্য বিক্রির প্রতিযোগিতার এক অমোঘ নিয়মের অধীন বিধায় বেচারা পণ্যের মালিক এই বিধির নিকট অসহায়।

তাই,পণ্য বিক্রির জন্য যুদ্ধ সহ দুনিয়ার তাবৎ দুস্কর্ম সংঘটনেও পিছপা হওয়ার সুযোগ নাই বেচারা পণ্য বিক্রেতা পুঁজিপতির। যদিও পুঁজিপতি মাত্রই সম্পত্তি হারানোর ভয়ে ভীতু এক প্রাণী। তবু, পণ্য বিক্রির শর্তে- প্রয়োজনে ভয়ংকর হিংস্রজীবে পরিণত হতে পিছপা হওয়ার সুযোগহীন হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণী । তাইতো, মহা মন্দার চাপে ও ভারে উন্মত্ত পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করেছে তেমন পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের কাল হতে অসংখ্য যুদ্ধের শিকার হয়েছে মানবজাতি, কেবলমাত্র পণ্য বিক্রির শর্তে তথা পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে।

তবে, পণ্য উৎপন্নে যত উন্নত ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় শ্রমের উৎপাদনশীলতা ততবেশী বাড়ে। আর শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত বাড়ে, তত কম শ্রমে পণ্য বিশেষ উৎপন্ন করা যায়। আবার, যে পণ্যে যত কম শ্রম নিষিক্ত হয়, সে পণ্যের দাম তত কম হয়। ফলে, পণ্যের দাম কমে, এবং পণ্যের কম দামের মাধ্যমে পণ্যের মালিক বাজার জয়ে সক্ষম হয়। অতঃপর, পুঁজিপতি মাত্রই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কম শ্রমে বেশী পণ্য উৎপন্ন করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তাই, আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও প্রতিযোগিতার এই নিয়মও পুঁজিপতিদের ইচ্ছা নিরপেক্ষ। সুতরাং, পুঁজিপতি মাত্রই কম শ্রমে বেশী পণ্য উৎপন্নের নিয়মের অধীন।

কাজেই, পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরাম বৈপ্লবীকরণ না ঘটিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। অর্থাৎ আন্তঃপ্রতিযোগিতায় লিপ্ত **পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্তিত্ব রক্ষার শর্ত হচ্ছে পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরাম বৈপ্লবীকরণ।** আবার উৎপাদনের যন্ত্রপাতির এই অবিরাম বৈপ্লবীকরণে নিরন্তর পরিবর্তন ঘটে উৎপাদন সম্পর্কের। ফলে,সমাজের সম্পর্কাদির মধ্যেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায় পুঁজিপতি শ্রেণী। কেউ পুঁজি হারায়, কেউ আবার অধিকতর পরিমাণ পুঁজির মালিক হয়, কেউ কর্মচ্যুত হয়, আবার কারো

কর্মসংস্থান হয়। রদ-বদল হতে থাকে সামাজিক বর্গগুলির স্থান। একই সাথে পারিবারিক সম্পর্কগুলো ছিন্ন-ভিন্ন হতে থাকে। অগত্যা, বিবাহ বর্হিভূত মেলা-মেশার স্বীকৃতি সমেত ও সম-লিংগে বিবাহের বৈধতা দেওয়া সত্ত্বেও বাড়ছে বিবাহে অনীহা, ভাংগছে পরিবার, অটুট থাকছে না নানান ধরণের সামাজিক সংগঠন। রাজনৈতিক দলগুলোও রেহাই পায় না আন্তঃকলহ, আন্তঃবিবাদ ও ভাংগনের কবল হতে। টিকে থাকতে অক্ষম রাষ্ট্রগুলোতো ভেংগে ভেংগে অনেক রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে। অবলুপ্ত হতে থাকে পরজীবীদের বানানো তথাকথিত পারিবারিক মূল্যবোধ এবং বিলীন হতে থাকে প্রভুদের তথা পরজীবীদের উদ্দেশ্যমূলক সৃজিত কথিত নীতি-নৈতিকতা। প্রাচীন ধারা ও পরম পূজনীয় সংস্কার ও মতামত ক্রমান্বয়ে অবলুপ্তির ধারায় পরিণত হয় বলে কথিত পবিত্র বিষয়াদি অবজ্ঞাপূর্ণ হয়ে উঠে। তাতে, মানুষ তার জীবনের প্রকৃত অবস্থা ও তার নিজের প্রজাতির সম্পর্কগুলির মুখোমুখি হতে বাধ্য হয় পরিমিত বোধ দ্বারা। দুর্দশা ও দুর্ভোগে ভরপুর জীবনের প্রকৃত অবস্থার মুখোমুখি হয়ে শ্রমিকদেরকেও চিন্তা করতে হয়, ভাবতে হয়, যেমন নিজেদের সম্পর্কে তেমন শোষণমূলক পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থা ও এই ব্যবস্থার সুবিধাভোগীদের বিষয়ে। লড়াইও করে থাকে শ্রমিকেরা তাদের শ্রম শক্তির ক্রেতা তথা তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে। লড়াই করতে গিয়ে গড়ে তোলে সংগঠন।আবার শ্রমিকদের সংগঠনও শ্রমিকদের চিন্তা-চেতনার প্রকাশ ও প্রসার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা আবশ্যকীয় বটে শ্রমিক ঐক্য অর্জনে।

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষার শর্তাধীন প্রগতিশীল পুঁজিপতি শ্রেণী, পণ্য বিক্রির জন্য দুনিয়া জয় ও দখল করে এক পুঁজিতন্ত্রী বিশ্ব ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে পুঁজির পরিমাণ যেমন বাড়িয়েছে তেমনি পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করেছে। কিন্তু, তার পর? পণ্যের বাজার বাড়ার সুযোগহীনতা। অতঃপর, প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্রের পতন ও বিনাশের কাল। পণ্য উৎপাদনের যন্ত্রপাতির অবিরাম বৈপ্লবীকরণ যেমন মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায় তেমন পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুনরুৎপাদনের ফলাফল হচ্ছে অতি উৎপাদন। আর অতি উৎপাদনের ফসল হচ্ছে উৎপাদিত মোট পণ্যের একটা পরিমাণ বিক্রি না হওয়া, অর্থাৎ অবিক্রিত পণ্যের মজুতাবস্থা। এরূপ মজুত অবস্থা বা পণ্য বিক্রি না হওয়ার অবস্থা হচ্ছে মন্দাবস্থা। মন্দা তথা মজুতের পরিমাণ যত বাড়ে তত অস্তিত্বের সংকটে পড়ে পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী।

কারণ, পণ্য বিক্রি না হলে পুঁজি ফেরৎ আসে না, অর্থাৎ পণ্য, অর্থ মূল্যে রূপান্তরিত হয় না। আর পণ্য, অর্থ মূল্যে রূপান্তরিত না হলে পণ্যের মালিক-মজুরি পরিশোধে ব্যর্থ হয়; কাঁচামাল সহ অপরাপর সার্ভিস খাত বাবত দেয় পরিশোধ করতে পারে না; ব্যাংক সহ অন্যান্য পাওনাদারদের প্রাপ্ত অর্থ পরিশোধে অক্ষম হয়; এবং পুনরুৎপাদনের সুযোগ হারায়। অথচ, পুনরুৎপাদন করতে না পারলে পণ্য মালিক স্বীয় পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না।
উপরন্ত, যে কোন পণ্য মালিকের পণ্য বিক্রি করতে না পারার ফলে ঐ পণ্যের কাঁচামাল সরবরাহকারী সহ যেসব শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এই শিল্পের সাথে যুক্ত ও জড়িত তারাও তাদের পণ্যের দাম ও পাওনাদি আদায় উসূলে ব্যর্থ হয়ে কেউ কেউ কোর্ট-কাছারীর আশ্রয় নিলেও প্রকারন্তরে সংশ্লিষ্ট সকলেই তাদের নিজ নিজ পণ্য বিক্রির সংকটে নিপতিত হয়। কারণ, এক শিল্পের উৎপাদিত পণ্য হয়তো আরেক শিল্পের কাঁচা মাল। তাই যে সকল শিল্প পুনরুৎপাদনে সক্ষম থাকে না তারাতো আর ঐ পণ্য উৎপাদনে কোন কাঁচামাল বা অনুরূপ প্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয় করে না। তদুপরি, যেসব শিল্প বা আর্থিক বা সেবা খাতে মন্দা দেখা দেয় তখন সেখানকার শ্রমিকরা চাকুরীচ্যুত হয়, অথবা প্রতিষ্ঠানের সাময়িক বন্ধের কবলে নিপতিত হয়। ফলে সংকটগ্রস্ত শিল্প বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকেরা হয় কর্মচ্যুত হয়ে মজুরি হারায়, না হয় কম মজুরি বা অনিয়মিতভাবে মজুরি পায়। ফলে, মন্দার শিকার শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ঐ সকল শ্রমিকেরা মন্দার আগে যে সকল পণ্য এবং যে পরিমাণ পণ্য ক্রয় করত, সেসব প্রতিটি পণ্য বা সেই পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে পারে না। তাই, ঐ সকল পণ্য উৎপাদনকারী শিল্পও পণ্য বিক্রির সংকটে নিপতিত হয়। আবার শ্রমিক ছাড়াও মন্দায় নিপতিত খোদ শিল্পপতি সমেত মন্দায় আক্রান্ত অপরাপর সকলেরই ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। তাই, মন্দাকালীন অবস্থায় পণ্যের মজুত কমে না বরং বাড়ে। এরূপ অবস্থায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল তাদের পাওনা আদায়েই ব্যর্থ হয় এমনটাও নয়, বরং নতুন বিনিয়োগের হারও মারাত্মকভাবে কমতে থাকে।কারণ, সংকটগ্রস্ত পণ্য মালিকেরা পুনরুৎপাদনে যেমন অক্ষম তেমন কোন নতুন শিল্পেও বিনিয়োগে অক্ষম আর যারা সংকটে নিপতিত নয় তেমন বিনিয়োগকারীরাও মন্দার পরিস্থিতি জনিত ঝুঁকির কারণে নতুন বিনিয়োগে উৎসাহী হয় না বলে সামগ্রীকভাবে বিনিয়োগকারীর সংখ্যা যেমন কমে তেমন বিনিয়োগের হারও ভয়ানকভাবে সংকোচিত হয়।ফলে,শেয়ার মার্কেট সহ মুদ্রা বাজারে সংকট তৈরী হয়। আর বিনিয়োগের হার যত কমে তত নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ কম সৃষ্টি হয়। অথচ, শ্রম বাজারে নতুন শ্রম শক্তির বিক্রেতার হার না কমে বরং

বাড়ে । কারণ, স্বাভাবিক নিয়মেই শ্রম বাজারে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক শ্রম শক্তির বিক্রেতা হাজির হয় শ্রম শক্তি বিক্রি করতে আর মন্দার কারণে যারা কর্মচ্যুত হয়েছে তারাও শ্রম বাজারে পুনঃপ্রবেশ করে।

ফলে চাহিদার তুলনায় শ্রম শক্তি বিক্রেতার সরবরাহ বাড়ে বলে মজুরির হার কমতে থাকে। তাতে, একদিকে যেমন বেকারত্বের হার বাড়ে অপরদিকে শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর প্রতিক্রিয়ায়ও পণ্য বিক্রির হার আরো হ্রাস পায়। আর পণ্য বিক্রির হার যত হ্রাস পায় তত পণ্যের মজুত আরো বাড়ে।ফলে, মজুত তথা মন্দা , পণ্যের অর্থ মূল্যে এবং অর্থের পণ্য মূল্যে রূপান্তরের পথে এক ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে অর্থাৎ মন্দায় পুঁজির অস্তিত্বের দুই শর্তের একটি- সঞ্চালন ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা ও সংকটে নিপতিত হয়; আবার, সঞ্চালনের অমন ভয়ানক প্রতিকুলতা ও প্রতিবন্ধকতা পুঁজির অস্তিত্বের অপর শর্ত - পুনরুৎপাদন ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে বাঁধাগ্রস্ত, সংকটাপন্ন,বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে অর্থাৎ মন্দা-সামগ্রীক পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থাকে সংকটাপন্ন করে তোলে। ফলে, পুঁজির অস্তিত্বের দুটি শর্তই ভয়ানক রকমের সংকট ও প্রতিবন্ধকতায় নিপতিত হয়ে এক নৈরাজ্যিক অবস্থার সৃষ্টি করে বিপুল পরিমাণ পুঁজি এবং পণ্যের বিপুল মজুতের চাপ-ভার সামাল দিতে সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতি শ্রেণী যুদ্ধ সমেত যে সব পন্থা অবলম্বন করে তাতে বিপুল পরিমাণ পণ্য ধ্বংস করে গোটা পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থাটাকেই ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করায় কেবলই পুঁজিরই অস্তিত্বের শর্তে।

অর্থাৎ পুঁজির অস্তিত্বের শর্তদ্বয়ই পুঁজির অস্তিত্বের সংকট তৈরী করে। প্রকৃতপক্ষে, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তদ্বয় পূরণ না করেও পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করা যায় না, আবার অস্তিত্বের শর্তদ্বয় পূরণ করলেও পুঁজি অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না পুঁজিপতি শ্রেণী। কারণ,পুঁজির অস্তিত্বের শর্ত পূরণ করে পুনরুৎপাদন করলে মন্দা দেখা দেয় আর মন্দায় অনেক পুঁজিপতি সমেত বহু পুঁজি ধ্বংস হয় আবার পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুঁজিকে পুনরুৎপাদনে বিনিয়োজিত না করলে পুঁজি অস্তিত্ব হারায়। অর্থাৎ, পুঁজি নিজেই নিজের অস্তিত্বের সংকটের কারণ ও ভান্ডার । তাই, পুঁজি স্বীয় অস্তিত্বের শর্তেই সংকট মুক্ত হতে পারে না বলেই পুঁজিপতি শ্রেণীও সংকট মুক্ত হওয়ার সুযোগহীন। ফলে, পুঁজির অস্তিত্বের সংকটের কারণে উভয় সংকটে নিপতিত পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির সংকট সমাধানে যত চেষ্টাই করুক, তা কেবল ব্যর্থই হয় না বরং পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার সংকট আরো বাড়িয়ে তোলে কার্যত পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই।

আসলে অজস্র পণ্য উৎপন্নের সমাজ-পুঁজিতন্ত্র, পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণীর অস্থিত্বের শর্তে যে পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন করে সে পরিমাণ পণ্য ধারণ করার

ক্ষমতা পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বের নাই বলেই মন্দা পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থার এক নিরাময় অযোগ্য ব্যাধি। অর্থাৎ, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে পুনরুৎপাদন এবং পুঁজিপতির অস্তিত্বের শর্তে উৎপাদনের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির অবিরাম বৈপ্লবীকরণের মাধ্যমে মোট উৎপাদনকে যে পরিমাণ বাড়িয়ে তোলে কেনা-বেচার পুঁজিতন্ত্রী উৎপাদন প্রণালী ঠিক সে পরিমাণ পণ্য ব্যবহার বা ধারণ করতে পারে না খোদ পুঁজিতন্ত্রী সমাজ। ফলে, পণ্য বিক্রির জন্য পণ্য মালিকেরা একে অপরের বাজার তথা পরস্পরের উপনিবেশ দখল-বেদখল করতে যুদ্ধ সহ তাবৎ অনিয়ম, অবৈধ ও অন্যায় পন্থার অবলম্বন করেছে। আর যুদ্ধ মানে কেবল ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত হত্যাকান্ডই নয়,বরং ধর্ষণ যেমন যুদ্ধের অনুসংগ তেমন অগ্নিসংযোগ, লুটপাট সমেত পুঁজিতন্ত্রের কালে আধুনিক কল-কারখানা সমেত যোগাযোগ ও পরিবহনের অবকাঠামো ও স্থাপনা সমেত বিপুল পণ্যের ধ্বংস সাধন।

অতঃপর, যে পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজিতন্ত্র বিকাশে যুদ্ধ করেছিল প্রাক পুঁজিতন্ত্রী ব্যবস্থা এবং ঐসব সামাজিক ব্যবস্থাগুলোর সুযোগ-সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে, সেই পুঁজিপতি শ্রেণী মন্দা মোকাবেলায় যুদ্ধ করেছে নিজের বিরুদ্ধে। হোক না স্বয়ংঘাতি যুদ্ধ কিন্তু করতে হয়েছে এবং এইরূপ স্বয়ংঘাতি যুদ্ধ বহুবার করেছে পুঁজিপতি শ্রেণী কেবলই পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে তবে স্ববিরোধীভাবে বিপুল পণ্য ও বিশাল অংকের পুঁজি ধ্বংস করে। বিপুল জীবনহানি সহ বিপুল পণ্যের ধ্বংস সাধন ও বিরাট অংকের পুঁজির বিনাশ সাধনে পুঁজির গোলামকুল-পুঁজিপতি শ্রেণী ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে বাধ্য হয়েছে পুনঃপুন যুদ্ধ করতে। তাই, **পুঁজিতন্ত্রে যুদ্ধ পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাধীন একটি বিষয় বলেই পুঁজিতন্ত্রী সমাজ হচ্ছে একটি যুদ্ধ প্রবণ সমাজ**। আবার যুদ্ধ না হলে যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট খাতে যে পরিমাণ পুঁজি বিনিয়োজিত হয়েছে তার অংশ বিশেষও ফেরৎ আসবে না। ফলে, যুদ্ধাস্ত্র উৎপাদন ও সংশ্লিষ্ট খাতে বিনিয়োজিত পুঁজি অস্তিত্ব হারাবে। তাই, যুদ্ধের শর্তে বন্দী বটে পুঁজিপতি শ্রেণী। এই যুদ্ধের জন্যই পুঁজিপতি শ্রেণী পৃথিবীর মোট বার্ষিক উৎপাদনের ২% ব্যয় করে থাকে কেবলমাত্র সামরিক খাতে এবং তৈরী করছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র । তাই, যুদ্ধমুক্ত বিশ্ব যেমন পুঁজিতন্ত্রে অসম্ভব, তেমন যুদ্ধ করেও পুঁজিকে রক্ষা করতেও অক্ষম বটে পুঁজিপতি শ্রেণী পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই। সুতরাং, অস্তিত্বের শর্তেই অস্তিত্বহীনতার শর্ত তৈরীকারী পুঁজি নিজে যেমন উভয় সংকটের অধীন, তেমন পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজিপতি শ্রেণীও ভয়ানক সংকট ও মারাত্মক উভয় সংকটের অধীন। অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্ন করলেও বিপদ বা সংকট আবার পুঁজি উৎপন্ন না করলেও বিপদগ্রস্ত বটে পুঁজিপতি শ্রেণী। সুতরাং, পুঁজির

অস্তিত্বের শর্তদ্বয়ই যেমন পুঁজির তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর বিনাশ তথা অনাস্তিত্বের শর্ত তৈরী করছে।

যুদ্ধবাজ বটে বুর্জোয়া শ্রেণী, যুদ্ধ সংঘটনকারীও বুর্জোয়া শ্রেণী। কিন্তু, যুদ্ধের তাবৎ কুফল ও দুর্ভোগ কেবল একা বুর্জোয়া শ্রেণী ভোগে না,বরং প্রতিটি যুদ্ধে জীবনহানি, পঙ্গুত্ববরণ সমেত নানান দুর্যোগ,দুর্দশা ও দুর্ভোগের ভয়ানক শিকার হয়েছে শ্রমিক শ্রেণীও।

উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিবরণ হতে এটি সুস্পষ্ট যে, পণ্য উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকানা হচ্ছে ব্যক্তিগত আর উৎপাদনের আধুনিক উপায় সমূহ মজুরেরা ব্যবহার করে যৌথ/সামাজিকভাবে, এটি পুঁজিতন্ত্রী সমাজের স্ববিরোধীতা। আবার, পুঁজিপতি শ্রেণী পণ্য উৎপাদন করে থাকে সমাজের জন্য কিন্তু পণ্যের মালিক বটে পুঁজিপতি এটিও পুঁজিতন্ত্রের স্ববিরোধীতা। অন্যদিকে, পুঁজি উৎপন্ন হয় সামাজিকভাবে বা সামাজিক শ্রমে কিন্তু পুঁজির মালিক বটে ব্যক্তি পুঁজিপতি, এটিও পুঁজিতন্ত্রের স্ববিরোধীতা। পুঁজি উৎপন্ন না করেও যেমন পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করা যায় না, তেমন পুঁজি উৎপন্ন করেও পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষিত হয় না, এটাও পুঁজিতন্ত্রী সমাজের স্ববিরোধীতা এবং এই সব স্ববিরোধীতা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রের এক অমোঘ বিধান।

এসব স্ববিরোধীতার সমাধান যেমন পুঁজিতন্ত্রে অসম্ভব, তেমন ব্যক্তিমালিকানার স্বার্থ ও শর্ত রক্ষা তথা পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়ে পুনরুৎপদন করা সহ পুঁজিপতি শ্রেণী যেভাবে পণ্য উৎপাদনের জন্য নতুন নতুন অত্যাধুনিক উপায়/যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও ব্যবহারে বাধ্য বটে পুঁজিপতি শ্রেণী তবে সেসব নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে যে পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করতে বাধ্য হয় পুঁজিপতি শ্রেণী সেই পরিমাণ পণ্য ব্যবহারে অক্ষম বটে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ। তাই, উৎপাদনের নতুন নতুন হাতিয়ার বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে বাধ্য পুঁজিপতি শ্রেণী ইচ্ছা নিরপেক্ষভাবে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে মজুত তথা মন্দা সৃষ্টি করতেও বাধ্য বটে সংকটাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণী।

তাই, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার মন্দা হচ্ছে মূলত পণ্য উৎপাদনের সামাজিক সম্পর্ক তথা ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে পণ্য উৎপাদনের আধুনিক যন্ত্রপাতির বিদ্রোহ। অর্থাৎ পুঁজিপতি শ্রেণীর উদ্ভাবিত উৎপাদনের নতুন নতুন উপায়/যন্ত্রসমূহের উপযুক্ত ও যথাযথ ব্যবহার করার সুযোগ বা সক্ষমতা পুঁজিপতি শ্রেণীর নাই। আবার এই সব আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার না করার অবকাশও বুর্জোয়া শ্রেণীর নাই। কারণ, পুঁজি বিনিয়োগ করেই যেহেতু এসব নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও ক্রয় করতে হয়,সেহেতু বিনিয়োগকৃত পুঁজি ফেরৎ পাওয়া ও উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপন্ন করতে এইসকল যন্ত্রের ব্যবহার করতে

মালিকেরা যেমন বাধ্য তেমন এসব নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে যে পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হয় তা বিক্রি করার সুযোগ পুঁজিতন্ত্রী বিশ্বে নাই। অথচ, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও ব্যবহার না করেও যেমন পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম নয় আবার এই সব যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করেও পুঁজির মালিক অতিরিক্ত পুঁজি আয় করা নয় বরং বিনিয়োগকৃত পুঁজিও ফেরত পায় না অতি উৎপাদন তথা মন্দার কারণে। এটিও স্ববিরোধীতা বটে পুঁজিতন্ত্রের। অর্থাৎ, পুঁজি নিজেই স্ববিরোধীতার যেমন উৎস ও ভান্ডার তেমন স্ববিরোধীতার শিকার। সুতরাং, নানান স্ববিরোধীতায় ভরপুর পুঁজিতন্ত্রী সমাজে পুঁজির অস্তিত্বে শর্তেই পুঁজিপতি শ্রেণী উভয় সংকটে নিপতিত।

এই উভয় সংকট হতে মুক্তির উপায় পুঁজিপতি শ্রেণীর নাই। কারণটা খোদ পুঁজি। তাই, পুঁজিতন্ত্রী সমাজের এক অপরিহার্যযোগ্য ও অনিবার্য বিষয় হচ্ছে মন্দা। উল্লেখ্য, তুলা শিল্প মন্দায় পড়ে ১৭৭০ সালে। ১৮১৫ সালের মন্দা স্থায়ী হয় ১৮২১ সাল পর্যন্ত। ১৮২৫ সালের মন্দা ভয়াবহ রূপ নেয়। ১৮৩১ থেকে ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত ছিল মন্দা। ১৮৩৭ ও ১৮৩৮ সাল মন্দা। ১৮৪৩ সাল মন্দা। ১৮৪৭ সাল মন্দা। ১৮৫৭ সাল মন্দা। ১৮৬২ ও ১৮৬৩ সাল মন্দা। উল্লেখিত তথ্যগুলো মার্কস কর্তৃক রচিত পুঁজি গ্রন্থ হতে নেওয়া হয়েছে।

অতি উৎপাদনের চরম মজুত তথা চরম প্রাচুর্যের এসব মন্দায়- স্টক বা শেয়ার বাজারে ভয়ানক ধ্বস, ফলে ছোট-বড় অনেক শেয়ার হোল্ডারের পুঁজি হারিয়ে পথে বসা; বহু শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয় সম্পূর্ণ না হয় আংশিক বা সাময়িক বন্ধ;চরম বেকারত্ব ও দারিদ্রতার প্রসার; শ্রমিক অসন্তোষ ও হিংসাত্মক শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপ্তি; রাজনৈতিক অসন্তোষ প্রকটতর হওয়া ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বির্পযয়; সামাজিক বিশৃংখলা তথা নৈরাজ্যিক অবস্থার সৃষ্টি; লুট-পাট, দাংগা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ-গৃহ যুদ্ধ, আঞ্চলিক যুদ্ধ এবং যুদ্ধ যুদ্ধ অবস্থা ; বহু পুঁজিপতির দেউলিয়া হওয়া বা ধ্বংস হয়ে মজুরি দাসে অধঃপতন; উৎপাদন সীমিতকরণ ও নিয়ন্ত্রণকরণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা; একই শিল্পের বা নানান শিল্পের একত্রিতকরণ; বহুজাতিক কোম্পানীর সংখ্যা বৃদ্ধি; এবং ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সম্পত্তির রাষ্ট্রীয়করণ আবার রাষ্ট্রায়ত্তখাতের বেসরকারীকরণ বা রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠানাদির সংকোচন বা বন্ধকরণ বা বিলোপ সাধন অথবা, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিখাতের পার্টনারশীপের (পিপিপি) পত্তন ইত্যকার বিষয়াদি সাধারণভাবে হয়ে থাকে।

অতঃপর, উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা যেমন পুঁজির অস্তিত্বের শর্তদ্বয়ের বিরোধী বলে এধরণের প্রচেষ্টাদি কার্যত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি ব্যক্তিমালিকানা বিরোধী তেমন শিল্পের একত্রিকরণসমেত বহুজাতিক

কোম্পানি গঠন ইত্যাদি কেবল ব্যক্তিমালিকানার অক্ষমতাই প্রকাশ করছে তাহাই নয়, বরং ব্যক্তিমালিকানার পরিধিকে সীমিত ও সংকোচিত করে বহুজনের বা যৌথ মালিকানার বহুজাতিক কোম্পানী সমেত নানান প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক মালিকানার পথ ও ভিত্তির পত্তন ও প্রশস্ত করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, হালে গুরুত্বহীন হলেও রাষ্ট্রায়ত্তখাত এবং সমবায় খাতের সহিত বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকানাধীন সম্পত্তির পরিমাণ যোগ করা হলে দেখা যাবে এই খাতত্রয়ী বিশ্ব অর্থনীতিতে একচ্ছত্রভাবে প্রধান ও নিয়ামক ভূমিকা পালন করছে।উপরন্ত, আই এম এফের বৈশ্বিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কেবল আই এম এফের সদস্য রাষ্ট্র বিশেষই নয় বরং সারা দুনিয়ার পুঁজিপতিদেরকে আই এম এফের নীতি-কৌশল অনুযায়ী সাধারণভাবে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। ফলে, আই এম এফের বৈশ্বিক কর্তৃত্বের কারণে কার্যত ব্যক্তিমালিকানার কর্তৃত্ব ভয়ানকভাবে ক্ষুন্ন ও বিঘ্নিত হচ্ছে। অন্যদিকে, সদস্যপদের শর্তে সকল সদস্য রাষ্ট্রের উপর কঠোর নজরদারী করে থাকে আই এম এফ। তবু, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজি বিনিয়োগে আই এম এফের কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা, আড়াল ও গোপন করার প্রচেষ্টাও আছে বুর্জোয়াদেরই কারো কারো, যা আই এম এফের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতাকে সামনে আনে। এটিও পুঁজিতন্ত্রের স্ববিরোধীতা। তবে, উপরোক্ত সকল সংস্থা, সংগঠন পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা করছে।

আবার,পুঁজিতন্ত্রের সেবা করছে বলেই এসব প্রতিষ্ঠানও সকলেই যেমন সফল হচ্ছে না তেমন টিকে থাকেনি অন্যান্য অনেক প্রতিষ্ঠান। যেমন, লীগ অব ন্যাশনস টিকে থাকেনি; জন্মকালীন উদ্দেশ্য মন্দা পরিহারে সফল হয়নি দুনিয়ার সর্বাধিক শক্তিশালী সিন্ডিকেট খোদ আই এম এফ; রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের সঞ্চিত পুঁজির অবাধ ব্যবহারে ব্যক্তিমালিকানা ছিল অপরিহার্য। তাই, স্ব-সৃষ্ট কারণেই বিনাশ ও বিপর্যয় অনিবার্য ছিল বটে লেনিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রী রাষ্ট্র -সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সোভিয়েত ব্লকের। অতঃপর. ১৯৮০ দশকের মন্দার অভিঘাতের সময়ে হারিয়ে গেছে সোভিয়েত ব্লক; বিলিয়নিয়ার-মিলিয়নিয়ার তৈরী করা সহ বাজার অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি-কৌশল গ্রহণ করে টিকে থাকার চেষ্টা করছে লেনিনবাদী মোড়ল তবে দুনিয়ার কুখ্যাত খুনি মাওয়ের চীন; খোল-নলচে পাল্টিয়েছে ভিয়েতনাম, কিউবাও বাদ যাচ্ছে না; এবং বহু বড় বড় ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সহ দুনিয়ার চতুর্থ বৃহৎ মোটরগাড়ী প্রস্তুতকারী কোম্পানী জেনারেল মোটরস দেউলিয়া হয়েছে ২০০৮ সালের মন্দার তান্ডবে।

অতঃপর,মন্দা হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ তথা ব্যক্তিমালিকানা বিপন্নকারী ও বিধ্বস্তকারী। অথচ, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা। আর, মন্দা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তি মালিকানাকে বিপন্ন ও বিধ্বস্তই করে না কেবল বরং ব্যক্তিমালিকানার অবলুপ্তিতে সামাজিক মালিকানার পথকে প্রশস্ত করছে। তাই, মন্দায় নিপতিত হয়ে পুঁজিতন্ত্র যেমন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হয়েছিল তেমন পুঁজির অবলুপ্তির কবল হতে রেহাই পাওয়ার জন্য লাজ-লজ্জাহীন পুঁজিপতি শ্রেণী আশ্রয় নিয়েছিল দাস প্রভু ও সামন্তপ্রভুদের রাজনীতি তথা ধর্মের নিকট, যে রাজনীতিকে পরাজিত করেছিল প্রগতিশীল পুঁজিপতি শ্রেণী। ফলে, মন্দার আরেক পরিণতি- ইতিহাসের চাকাকে পিছনে ঘুরাতে অতীতের গর্তে আশ্রয় নিয়ে পঁছা-দুর্গন্ধময় এবং পরিত্যক্ত ও অশক্ত -অপোক্ত খড়-কুটা ধরে যেকোনোমতে টিকে থাকার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়ে পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থ, অযোগ্য তাই সমাজের অগ্রগতি সাধনে অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীতে পরিণত হওয়া।

পুঁজিতন্ত্রের এই রূপ বার্ধক্যাবস্থায় পুঁজির গোপন রহস্য তথা পুঁজির কোড বা নিয়ম এবং সমাজ পরিবর্তনের কোড বা সূত্র আবিস্কার করে মার্কস আবিস্কার করলেন সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান। রচিত হল 'পুঁজি', 'ফ্রান্সে শ্রেণী সংগ্রাম', 'ফ্রান্সে গৃহ যুদ্ধ', 'সমাজতন্ত্র : কাল্পনিক ও বৈজ্ঞানিক' সহ নানান পুস্তক সমেত নানান রচনাবলী যাতে সমাজ বিকাশের নিয়ম, সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, সমাজ পরিবর্তনের সূত্র, পুঁজি এবং পুঁজির পরিণতি বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তবে, সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার হচ্ছে খুব সংক্ষেপে পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্রের ভূত- ভবিষ্যত সমেত ইতিহাসের এক খাস খতিয়ান। এককথায় এটি হচ্ছে পুঁজিপতি শ্রেণীর মৃত্যু পরোয়ানা। অতঃপর, মার্কস-এ্যাংগেলসদের রচিত এসব সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যও মরণব্যাধি মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিতন্ত্রের আরেক ফসল।

কমিউনিস্ট লীগ, শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম আন্তর্জাতিক সমিতি, প্যারী কমিউন ইত্যাদি গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুঁজির স্বয়ংঘাতি ক্রিয়া-কলাপের প্রেক্ষিতে পুঁজিতন্ত্রী সংকট হতে উত্তরণে পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ সাধনে। তবে, ভয় পেয়ে যায় প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী। তাই, পুঁজিতন্ত্র বিরোধী এই সকল সংগঠনকে বিলুপ্তকরণে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী করেনি এমন কোন দুস্কর্ম নাই। তাইতো, ফ্রান্সকে যুদ্ধে পরাজিত করে ফ্রান্সের সম্রাটকে বন্দী করে বিজয়ী হয়েছিল যে জার্মানী, সেই জার্মানীর বুর্জোয়ারা কেবল ফ্রান্সের পুঁজিপতিদেরকেই নয়, বরং বিশ্ব পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও পরাজিত ফ্রান্সের পক্ষে গুন্ডামি করে ভয়ানক হিংস্রতায় প্যারী

কমিউনকে দমন ও বিলীন করেছিল। অথচ, প্যারি কমিউনের সাথে সরাসরি বিরোধ ছিল না জার্মানীর। তবু,পরাজিতের পক্ষে বিজিতের গুন্ডামির এরূপ নির্লজ্জ ইতিহাস বিশ্বে প্রথম তৈরী করল বটে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী। তবে, প্যারি কমিউনের পতনের মাধ্যমে এটিও প্রমাণিত হল যে, আন্তঃবিরোধ যতই থাকুক না কেন নানান দেশের পুঁজিপতিরা সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে তথা পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়; এবং দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য ছাড়া যে, পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত ও বিলুপ্ত করা যায় না তাও প্রমাণিত হল।

১৯০৩ সালে মহা মন্দায় নিপতিত হয় প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী। উত্তরণের উপায় জানাহীন স্বার্থান্ধ বুর্জোয়া শ্রেণী সংঘটিত করল প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ। জন্মকালীন প্রতিশ্রুতি বিসর্জন দিয়ে ২য় আন্তজাতিকের প্রভাবশালী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার রাজনৈতিক লাইন– তথাকথিত 'জাতি সমূহের আত্ম–নিয়ন্ত্রণ অধিকার' তথা জাতিয় মুক্তির অনুসারী লেনিনের নেতৃত্বাধীন **বলশেভিক পার্টি মজুরকে শোষণ করে রাশিয়ায় পুঁজির পরিমাণ বাড়িয়ে পুঁজিতন্ত্রী প্রণালীর বিকাশ সাধনের নিমিত্তে "প্রতিক্রিয়াশীল কৃষক" সহ গঠিত জন্ম মূলে ছিল বটে এক প্রতিক্রিয়াশীল পাটি**।

তবে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সুযোগে একটি পরিকল্পিত সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাশিয়ায় একটি রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সামরিক অভ্যুত্থানকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের এক চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্র হিসাবে প্রচার করে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে বিভ্রান্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের বৈশ্বিক প্রসার ঘটাতে লেনিন–ট্রটস্কিরা তথাকথিত ৩য় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠা করে দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের শৃংখলে বন্দি করতে এবং দেশ–জাতির গন্ডীতে আবদ্ধ করার রাজনীতি তথা কথিত জাতীয় মুক্তির বিষাক্ত ধারণার কর্দমাক্ত গহ্বরে নিক্ষেপ করে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী পরিচয় ভুলিয়ে দিয়ে ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছিল। প্রথাগত বুর্জোয়ারাও লেনিনের রাষ্ট্রকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রচার করে।

অতঃপর, লেনিনের পক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের সমাজতন্ত্র বিষয়ে এমন ভুয়া–বানোয়াটি ও মিথ্যা রটনা ও প্রচারণায় দুনিয়ার শ্রমিকদের মধ্যে কেবল সমাজতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই নয় বরং সত্য নয় জেনেও বদ মতলবে লেনিন ভুয়াভাবে দেশের ভিত্তিতে সমাজকে চিহ্নিত করে বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিভ্রান্তি তৈরী করেছে। উপরন্ত, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের বিষাক্ত লেনিনবাদের জাতীয় মুক্তির রাজনীতির চোরাবালিতে ডুবিয়ে দুনিয়ার

শ্রমিকদেরকে কেবল দেশ-জাতিতে ভাগ-বিভাগ ও গন্ডীবন্ধ করার অপচেষ্টাই করেনি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী বরং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ ও শ্রেণী পরিচয়কে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে স্থানীয় পুঁজিপতিদের সেবা করার কৌশলী প্ররোচনায় প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত হয়েছে দুনিয়ার শ্রমিকদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ। অন্যদিকে, প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ জয়ীরা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর স্বাধীন কর্তৃত্ব খর্ব করে 'লীগ অব নেশনস' গঠন করে পুঁজির অস্তিত্ব রক্ষার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যর্থ।

তাই,পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে ১৯২৯ সালে আবারো দেখা দেয় মহা মন্দা। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এবং যুদ্ধটা ছিল মন্দার চাপে ও ভারে সংকটাপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীর আন্তঃবিরোধের সস্বশ্র বহিঃপ্রকাশ। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মন্দা ঠেকাতে লেনিনবাদী মোড়ল স্তালিনের একক কর্তৃত্বাধীন সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত বিশ্ব যুদ্ধ জয়ী রাষ্ট্রত্রয়ীর

(যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন) প্রধান নির্বাহীরা রাষ্ট্র সমূহের আয়-ব্যয়ের ক্ষমতা তথা রাজস্ব বা করনীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রকারন্তরে বাজেট নীতিতে হস্তক্ষেপ; আই এম এফের চুক্তিপত্র ও সিদ্ধান্ত মান্য ও বাস্তবায়নের শর্তে এমনকি নিজ নিজ সংবিধান সংশোধনের ও তদোপযোগী আইন-কানুন প্রণয়নে বাধ্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হানি ও বিঘ্ন; ক্ষেত্র বিশেষ বিচার বিভাগের কর্তৃত্বকেও কিঞ্চিতভাবে হলেও ক্ষুন্ন বা অবজ্ঞা; এবং মুদ্রা মূল্য ও মুদ্রা নীতিতে হস্তক্ষেপ করা সহ আবশ্যকীয় বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ব বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করা সহ পুঁজির স্বার্থ বৈশ্বিকভাবে দেখভাল ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্রসমূহকে ডিফাঙ্কট করে ৫১টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠন করে বিশ্বের সর্বাধিক ক্ষমতাধর সিন্ডিকেট-আই এম এফ। পরিত্যক্ত হয় উপনিবেশিকতার নীতি। অবশ্য পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের নীতি-উপনিবেশিকতা পুঁজিতন্ত্রের বার্ধক্যে কার্যকারিতা হারাবে এবং অচল ও বাতিল হবে এটাই স্বাভাবিক। অতঃপর,বদমতলবজাত মূলে রচিত নানান বাহুল্য সমেত বহুল প্রচারিত কথিত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথিত কার্যাদির ফলাফল নয় বরং উপনিবেশিকতার নীতি বাতিল এবং বিশ্বময় পুঁজি, পণ্যের অবাধ চলাচলের নীতি কার্যকরণে উপনিবেশগুলি নতুন নতুন তবে কথিত স্বাধীন-সার্বভৌম নয় বরং ডিফাঙ্কট রাষ্ট্রে পরিণত হল।

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য সংখ্যা ৫১ হলেও এখন আই এম এফের সদস্য সংখ্যা-১৯৮,আর সদস্যপদের আবেদনকারী হচ্ছে ১০। তবে, এক দংগল ধান্ধাবাজ, অর্থ লোলুপ ও ক্ষমতাবাজ রাজনৈতিক সমেত এই রাষ্ট্রগুলোর ব্যয়ভার মজুরদেরকে বহন করতে হলেও জাতীয় মুক্তি, দেশপ্রেম. স্বাধীনতা, জাতীয়

উন্নতি ও সমৃদ্ধি, জাতীয় স্বার্থ ইত্যকার বিষয়ে নানান ভুল-বাল ও অসত্য এবং বানোয়াটি গাল-গল্প রটনা ও প্রচার এবং এসবের প্ররোচনায় মজুরদেরকে কেবল আচ্ছন্ন ও বিভ্রান্ত করাই নয় বরং এসব দেশ-জাতির সীমা-গন্ডী ও বোধে আবদ্ধ করে রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রের বিরোধের ক্রিয়া-কলাপে বিনা মজুরির কামলা হিসাবে যুক্ত ও জড়িত করে দুনিয়ার মজুরদের একতার পথে ভয়ানক প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে। অথচ, মজুরের কোনো জাতি বা দেশ নাই। তবে, নিজেদের শৃংখল হারিয়ে জয় করার মত একটি বিশ্ব আছে শ্রমিকশ্রেণীর। তাই, দুনিয়ার শ্রমিকদের ঐক্য হচ্ছে তাদের মুক্তির প্রথম শর্ত। উল্লেখ্য, হালে দুনিয়ার রাষ্ট্রগুলোর পরিচালনা খরচ এবং ব্যয়ের পরিমাণ দুনিয়ার মোট উৎপাদনের ২৯% কম নয়। আর এই ব্যয় অন্যকিছুই না বরং শ্রমিকদের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত-মূল্যের অংশ বিশেষ মাত্র।

অথচ, তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ বা জাতীয় অর্থনীতি বা জাতীয় উন্নতি ও সমৃদ্ধি দেখাতো নয়ই বা তদ্রুপ কিছু দেখার সুযোগ বা অবকাশতো নাই-ই বরং পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বে প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকারের কাজ হচ্ছে নিজ নিজ এলাকায় বৈশ্বিক পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর ব্যবস্থাপনার দেখ-ভাল করা সহ নিজ নিজ এলাকায় বিশেষ বা মুক্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠন করে বিশ্বের পুঁজির পুনঃপুন পুনরুৎপাদন এবং পণ্য ও পুঁজির দ্রুত সঞ্চালনে আবশ্যকীয় বিহীতাদি সাধনে- বিমান ও নৌ বন্দর নির্মাণ ও সংস্কার; সড়ক, রেল ও নদীপথের নব্যতা সমেত পরিবহনের অব ও পরিকাঠামো নির্মাণে বিহীতকরণ; যোগাযোগ ও তথ্য-প্রযুক্তির উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের বিহীতকরণ; ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন; বিদুৎ ও জ্বালানীর সংস্থানের বিহীতকরণ; শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে বিহীতকরণ; প্রয়োজনে চরম স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; এবং মজুরদেরকে নিয়ন্ত্রণ, পীড়ন ও দমন করে বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা। একই কারণে, হালের ডিফাক্টো রাষ্ট্রগুলোর দায়িত্বে ও কর্তৃত্বে দুনিয়াময় পুঁজি ও পণ্যের অবাধ চলাচলের যাবতীয় বিহীতাদি সাধনের নীতি কার্যকরণের ক্রিয়াদির বৈশ্বিকভাবে নজরদারী, খবরদারী এবং তদার্থে প্রশাসনিক ও বিচারিক কার্যাদি সম্পাদনে ইতোমধ্যে আবশ্যকীয় চুক্তি (গ্যাট, ১৯৯৫ সালে সম্পাদিত) সম্পাদন সমেত তদার্থে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাও গঠিত হয়েছে আই এম এফের নীতি বাস্তবায়নে, তথা বৈশ্বিক মুক্ত বাজার প্রতিষ্ঠায় অর্থাৎ পুঁজির জন্য মুক্ত বিশ্ব গঠনে । অতঃপর, পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের এই রাজনীতির উদ্দেশ্য একটাই, মন্দার কবল হতে অব্যহতি লাভ। কিন্তু ব্যর্থ।

প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণীর তাবৎ ব্যর্থতা, অক্ষমতা তবু টিকে থাকার বেড়ায়াপনা সমেত পরজীবীতার বিশাল ও বিপুল ব্যয়ের চাপে মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্র আই এম এফের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও ১৯৮০ দশকে একবার দেখা দিয়েছিল মন্দা। ব্যাপক বেসরকারীকরণের মাধ্যমে এবং বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানকে হয় বন্ধ না হয় বিলোপ করার মাধ্যমে পণ্যের উৎপাদন হার ক্রমহ্রাস করার চেষ্টা হয়েছে। তবু ব্যর্থ।

অন্যদিকে, লেনিন-স্তালিনের চরম স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন সমেত সোভিয়েত ব্লকের পতনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র ও কথিত জাতীয় মুক্তির রাজনীতির মতবাদ তথা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বিষাক্ত লেনিনবাদের ক্ষতিকরতা ও অকার্যকারিতা প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে গুরু লেনিন ও তার শিষ্য- স্তালিন, ট্রটস্কি, ক্রুশ্চেভ, মাও, কিম, হোচি-মিন, ব্রেঝনেভ, হোক্সা প্রমূখ রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রীদের বানোয়াটি সমাজতন্ত্রের খোলস যেমন খসে পড়েছে তেমন কমিউনিস্ট না হয়েও সেরা কমিউনিস্ট দাবীদার এসব প্রতারক-ভন্ড ও পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের কৌশলী সেবকদের কুৎসিৎ মুখোশ উন্মোচিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হয়েছে। তাই, রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্র নয় বরং দুনিয়ার সকলের মালিকানার বিষয়টি সামনে এসেছে।

অতঃপর, মন্দার ইতিহাসের বিবরণ হতে এটি সুস্পষ্ট যে, খোদ বুর্জোয়া শ্রেণী সমেত তাদের রাজনৈতিক মোড়ল-মাতুব্বরদের চরম ব্যর্থতা এবং প্রতিটি মন্দার পরিণতি-অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার সংকোচন ও ন্যায্য সামাজিক মালিকানার পথ প্রশস্তকরণ।

সুতরাং, পুনঃপুন মন্দার ঐতিহাসিক পরিণতি- রাজনৈতিক সহ তাবৎ গুরু ও মোড়ল-মাতুব্বর সমতে পরজীবী বুর্জোয়া শ্রেণীর বিলুপ্তি এবং অযৌক্তিক ব্যক্তি মালিকানার যৌক্তিক বিনাশ ও বিলোপ তথা যৌক্তিক সামাজিক মালিকানার-সমাজতন্ত্র । অর্থাৎ উৎপাদনের উপায় ও বিনিময়ের মাধ্যম সমূহের অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার স্থলে ন্যায্য ও ন্যায় সংগত সামাজিক মালিকানা তথা উল্লেখিত উপায়সমূহে দুনিয়ার সকলের সাধারণ মালিকানা প্রতিষ্ঠা। প্রকৃতপক্ষে, **সামাজিক মালিকানা মানে কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তির দখলাবসান নয় বরং সামাজিকভাবে উৎপন্ন সম্পদের সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তিগত মালিকানা হাসিলের অন্যায় ও অন্যায্য সুযোগ বাতিলকরণ। ফলে, কেউ শোষক-শাসক আর কেউ শোষিত-শাসিত হবার মতো বস্তুগত ভিত্তি-ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকা।**

পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে সৃষ্ট মন্দার অনেক ফলাফলের অন্যতম একটি হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ ও শ্রমিক আন্দোলন। তবে, পুঁজির জন্মসূত্রেই শ্রমিক অসন্তোষ

ও শ্রমিক আন্দোলনের জন্ম। পুঁজির জন্মসূত্রেই পুঁজি উৎপন্নকারী মজুর আর পুঁজির মালিকের সম্পর্ক হচ্ছে শোষক-শোষিতের বিরোধপূর্ণ ও বৈরীতামূলক। এই বিরোধ ও বৈরীতা প্রকট রূপ ধারণ করে মন্দাবস্থায়। মন্দায় বিপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীও থাকে নানান ভাগে বিভক্ত ও নানান ধরণের প্রতিযোগিতা ও বৈরীতায় এমনকি লিপ্ত থাকে আন্তঃশ্রেণী যুদ্ধে । তাই, মজুতকৃত পুঁজির ভয়ানক ভারে ও মারাত্মক চাপে ভয়ংকর সমস্যা-সংকটে বিধ্বস্ত ও উন্মত্ত পুঁজিপতি শ্রেণীকে সমূলে বিনাশ করার মোক্ষ সুযোগ তৈরী হয় মন্দাকালীন সময়ে। অতঃপর, একেতো শোষিত তদপুরি মন্দায় আরো নানান দুর্দশা ও দুর্ভোগে নিপতিত তবে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী মন্দাকালীন সময়ে পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিলুপ্তকরণের মোক্ষ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

পুঁজি পুঞ্জিভূতকরণে তথা পুঁজি উৎপন্নে পণ্য উৎপাদনে দুনিয়ার শ্রম শক্তি ক্রয়-বিক্রয়কারী তথা পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধের অবসানে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালী ও পুঁজিপতি শ্রেণীকে বিলোপ ও বিনাশ তথা শ্রম শক্তির ক্রয়-বিক্রয়ের বিলোপন অর্থাৎ পণ্য বিলোপ তথা পুঁজির তিরোধান ছাড়া মজুরি দাসত্বের অবসান সম্ভব নয় অর্থাৎ পুঁজিতন্ত্রী শোষণ এবং মানুষ কর্তৃক মানুষের শাসনের অবসান ব্যতিত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি অসম্ভব। প্রকৃতার্থে, পুঁজিতন্ত্রে সমগ্র মানবজাতি পুঁজির শৃংখলে বন্দী। কারণ, পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে পুঁজির দাস আর মজুরি শ্রমিক হচ্ছে মজুরির দাস। আবার, উভয় শ্রেণী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে প্রণীত আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের অধীন তদপুরি, যদিও রাষ্ট্র ও বিদ্যমান বৈশ্বিক সিন্ডিকেটগুলো পুঁজিপতি শ্রেণীর শ্রেণী হাতিয়ার তবু উভয় শ্রেণীই রাষ্ট্র ও এইসব নানান বৈশ্বিক সিন্ডিকেটের জালে আটক। তাই, শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক অর্জিত মুক্তি কার্যত সমগ্র মানব জাতির মুক্তি। অতঃপর, পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থার বিনাশ তথা পুঁজির অন্তর্ধান অর্থাৎ বেচা-কেনার বিলোপন সুতরাং, ব্যক্তিমালিকানার অদৃশ্যায়ন ছাড়া ব্যক্তি মালিকানার স্বার্থে ও সংরক্ষায় শোষক-পরজীবিদের সৃষ্ট তাবৎ অমানবিক-নিষ্ঠুর ও বৈষম্যমূলক বা বর্বর ও অসভ্য প্রভুত্ব ও দাসোচিত ধারণা-দৃষ্টিভংগি, রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কৃতি, জঞ্জাল ও শৃংখল হতে মুক্ত হবে না সমগ্র মানব জাতি। কাজেই, কাউকে কথিত মহামানব সাজিয়ে তার জন্ম-মৃত্যু দিবস পালন সমেত পূঁজা-অচর্ণার জন্য শোষকদের সৃষ্ট তাবৎ বোধ ও শৃংখল হতে সমগ্র মানব জাতির মুক্তির শর্ত হচ্ছে পুঁজির বিলোপ, তথা পণ্য উৎপাদনী ব্যবস্থার বিলুপ্তি অর্থাৎ বেচা-কেনার বিনাশ তথা ব্যক্তিমালিকানার বিলুপ্তির মাধ্যমে উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যাবতীয় উপায় সমূহের সামাজিক/কমিউন বা দুনিয়ার সকলের সাধারণ মালিকানাধীন সাম্যতন্ত্রী সমাজ প্রতিষ্ঠা।

অতঃপর, মন্দার ফলাফলে প্রকট হতে প্রকটতর হওয়া সংকটে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত পুঁজিপতি শ্রেণী এবং বিক্ষুব্ধ ও সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর বিলোপ অর্থাৎ পুঁজি উৎপন্নকরণে,পণ্য উৎপাদনে দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা ও বিক্রেতার বিরোধের পরিণতি তথা অনুরূপ বিরোধের সমাপ্তি হচ্ছে সামাজিক মালিকানার সমাজতান্ত্রিক সমাজ। তাই, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি তথা মানবজাতির মুক্তির জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদের একতাবদ্ধ হওয়াটা হচ্ছে এক বিকল্পহীন শর্ত। আর এই বিকল্পহীন শর্ত পূরণে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি হচ্ছে অপরিহার্য ও বিকল্পহীন শর্ত। এই শর্ত পূরণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট লীগ ও প্রথম আন্তর্জাতিক। তবে, সফল হয়নি, শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হয়ে উঠার ক্ষেত্রে নানান সীমাবদ্ধতা ও বুর্জোয়াদের দমন সমেত বহুবিদ কারণে।

প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী টের পেয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত শক্তির প্রভাব ও গুরুত্ব। তাই, শোষক বুর্জোয়া শ্রেণী স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থে পুঁজিতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে মজুরদেরকে পুঁজি বিষয়ে মিথ্যা ঘোরে-বিভ্রমে বিভ্রান্ত-আচ্ছন্নকরণে কিছুটা কার্যকরী দাসপ্রভু ও সামন্তপ্রভুদের রাজনীতি- ধর্ম; শ্রমিকদের মুক্তি বিষয়ে বিভ্রান্ত করার রাজনীতি- লেনিনীয় সমাজতন্ত্র; দারিদ্রকে নির্বাসনে পাঠিয়ে সবাইকে ধনী বানানোর ভুয়া খোওয়াব দেখানোর ক্ষুদ্র ঋণের রাজনীতি অথবা, উপনিবেশিকতার নীতির সমাপ্তি ঘটিয়ে জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় উন্নয়নের মাধ্যমে জাতিয় সমৃদ্ধি হাসিলের জন্য নতুন নতুন রাষ্ট্রের পত্তনের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক মুক্তির ভুয়া প্রতিশ্রুতির রাজনীতি; দেশ বিশেষের মধ্যেই ধনী-দরিদ্রের ফারাক কমানোর ভুয়া সামাজিক ন্যায় বিচারের রাজনীতি এবং মন্দা পরিহারে বিশ্ব অর্থনীতিকে বৈশ্বিকভাবে একটি কেন্দ্র হতে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রাষ্ট্রকে ডিফাঙকট করে আই এম এফের প্রতিষ্ঠা; এবং শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে ভোতা ও অচলকরণে শ্রমিকদের প্রচলিত-প্রথাগত স্বার্থ ও সুযোগ-সুবিধাদি সংরক্ষা এবং অতিশয় কৌশলী ও ধুরন্ধর বুর্জোয়াদের ঘোষিত বৈশ্বিক শ্রম নীতি ও কথিত শ্রম অধিকার দেশে দেশে প্রতিষ্ঠা ও মালিক-শ্রমিকের শান্তিপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় ও শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবন মান ও কর্ম পরিবেশ উন্নয়নে মালিক-শ্রমিকের বিরোধ নিস্পত্তিতে বুর্জোয়াদের শ্রেণী হাতিয়ার রাষ্ট্রকে সুকৌশলে নিরপেক্ষ ও মধ্যস্ততাকারী সাবস্তে এতদ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বৈশ্বিকভাবে দেখ-ভাল করার জন্য মালিক-শ্রমিক ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সমন্বয়ে 'আই এল ও' নামীয় একটি বৈশ্বিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্বায়নের রাজনীতির প্রবর্তন সমেত উপরোল্লেখিত নানান পদের

তবে সাবেকীসহ নানান রাজনীতির প্রবর্তন, প্রত্যাবর্তন ও সংরক্ষণ করে যাচ্ছে।

উল্লেখ্য, বলা চলে কার্যত ঘোষিত লক্ষ্য বাস্তবায়নেও প্রকৃতই ক্ষমতাহীন তবু, আই এল ও'র সদস্য হতে গেলেও যে কোনো রাষ্ট্রর আইন, সংবিধান ইত্যাদি এই সংগঠনের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতেই হবে;অসমাঞ্জস্যতায় আবশ্যকীয় সংশোধন আবশ্যক। অতঃপর,কে বেশী ক্ষমতাধর অমন একটি ক্ষমতাহীন বৈশ্বিক সংগঠন, না কি এই সংগঠনের সদস্য তবে মজুরদের দমন-পীড়নে মহা প্রতাপশালী ও ভয়ানক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র বিশেষ?

পুঁজিতন্ত্রের বাণ্যিজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অফিস; পুঁজিপতি শ্রেণীর প্রবর্তিত, প্রত্যাবর্তনকৃত ও সংরক্ষিত সকল ধরণের রাজনীতির প্রচার, প্রকাশ, রক্ষা ও সংরক্ষা এবং কার্যকারিতায় ক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র, আই এম এফ ইত্যাদি সমেত এধরণের সকল প্রকারের প্রতিষ্ঠানের সকল স্তরের দফতর; এই সব রাজনীতির শিক্ষা-দীক্ষার নিমিত্তে অর্থাৎ প্রশিক্ষণ ও প্ররোচনামূলক কর্মতৎপরতার নানান ধাঁচের প্রতিষ্ঠানাদি; এই সব রাজনীতির বিশেষত দাসপ্রভু ও সামন্ত প্রভুদের রাজনীতি চর্চা ও কার্যকরণে গীর্জা -মন্দির সমেত এজাতীয় সকল প্রতিষ্ঠান; এই সব রাজনীতির সাফাইদার প্রিন্টিং সহ নানান মিডিয়া; এই সব রাজনীতির কৌশলী ফেরিওয়ালা ও কথিত মানবাধিকার সংস্থা-সংগঠন তথা এন জি ও সংগঠনসমূহের দপ্তর; এবং এই সকল রাজনীতির কথিত গৌরবময় অতিত, বিশ্বজনীন বৈধতা, কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্ব বিষয়ে ভুয়া-বানোয়াটি গাল-গল্পে ভরা বা মতাদর্শ ভিত্তিক সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির নানান বিভাগ এবং বিজ্ঞান বিষয়েও বিজ্ঞান বিরোধী বা বিজ্ঞানের বিকৃতকারী বই-পুস্তক তবে একমাত্র বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান নির্ভর পুস্তকাদি ছাড়া আর সকল বই-পুস্তক ও সাময়িকী তথা জন্ম সূত্রে সকল দুস্কর্মের সুপ্রিম নীতি-রাজনীতি ও রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে ও তদনিমিত্তে তথা ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বার্থে অর্থাৎ শোষণের স্বপক্ষে রচিত ও প্রকাশিত কোটি কোটি টন বই, পুস্তক সাময়িকী ইত্যাদি যা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য মারাত্মক বিষাক্ত ও ভয়ানক ক্ষতিকর, এই ধরণের সকল পুস্তাকাদির রক্ষণা-বেক্ষণের দপ্তর সমেত উপরোল্লেখিত সকল ধরণের দপ্তর এর নির্বাহী, মোড়ল, মাতুব্বর, বস, পরামর্শক, নেতা-পাতিনেতা, গুরু-পুরোহিত, রক্ষক-সংরক্ষক,কর্মকর্তা ও সুবিধাভোগীদের এক বিশাল পরজীবীর বহর, এক বিশাল ব্যয়ে লালন-পালন ও পরিপোষণ করছে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী।

কিন্তু, এই সব ধরণের পরজীবীদের খরচের যোগানদার বটে তাবৎ পরজীবীদের পরজীবিতার কারণে কষ্টকর ও দুর্ভোগ-দুর্দশায় জীবন পাত

করা শ্রমিক শ্রেণী। তবু, এই পরজীবীরাই পোদ্দার বটে এই অসম্ভব বিশ্রী ও কুসিৎ বুর্জোয়া সমাজের।অথচ,এই বিশাল ব্যয়ের ভয়ংকর এক পরজীবী গোষ্ঠীর ব্যয় বহনের দায় যেমন শ্রমিক শ্রেণীর নাই, তেমন এদের বিলোপ করা ব্যতিত শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তিও নাই।তবে, দুস্কর্মকারী এই পরজীবী শ্রেণীর ভারের আধিক্যে-চাপে পুঁজিতন্ত্রী সমাজ ক্রমাগত নিজেই চ্যাপ্টা, কুঁজো ও পংগু হয়ে ভেংগে চুরে চৌচির ও চুরমার হচ্ছে।

তাইতো,কথিত আদর্শবাদ ও নীতি-নৈতিকতার চরম অবক্ষয় হচ্ছে বলে তাবৎ গুরুকুল তারস্বরে চিৎকার করছে। কেউ কেউ সামরিক বলে কথিত নীতি-নৈতিকতার পুনঃপ্রবর্তনে স্বয়ংঘাতি পন্থা তথা চরম পন্থার প্রয়োগ করছে। সামগ্রীকভাবে রাজনীতির সামরিকীকরণ যেমন হচ্ছে তেমন রাষ্ট্রিক নির্বাহীগণ কেবলই স্বৈরতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করছে। ফলে, ভয়ানক রকমের আন্তঃকলহ ও আন্তঃবিবাদে জর্জরিত হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী। যদিচ, বুর্জোয়া বিশ্বায়নের রাজনীতি এবং তা বাস্তবায়নে সৃষ্ট বৈশ্বিক সংগঠন সমূহ বিশেষত আই এম এফের শাসনাধীনে রাষ্ট্রগুলো ডিফাঙ্কট হয়েছে বলে জাতীয় রাষ্ট্র যেমন মৃত তেমন বুর্জোয়াদের গণতন্ত্রও মৃত। কারণ, ভোটারদের মতামতের নীরিখে নয় বরং আই এম এফের নীতির ভিত্তিতে ডিফাঙ্কট রাষ্ট্রের আর্থিক নীতি গৃহীত হয়। তবে,ডিফাঙ্কট হলেও দমন-পীড়নে অকার্যকর নয় রাষ্ট্র।

বিশ্বায়নের রাজনীতিসমেত উপরোল্লেখিত তাবৎ রাজনীতির যতই চর্চা করুক না কেন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী তাতে যেমন মন্দার সংকট হতে রেহাই পায়নি তেমন এই ভয়ংকর মন্দার সমস্যা সমাধানে অক্ষম বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাধীনে সৃষ্ট মন্দা হতে রেহাই পাওয়ার কোনো পথ নাই। অন্যদিকে, শ্রমিক শ্রেণীর সহিত বৈরীতার অবসান ঘটানোর সুযোগও নাই বুর্জোয়াদের অথবা স্বীয় শ্রেণীর আন্তঃবিরোধ-আন্তঃকলহ হতেও অব্যহতি নাই ভয়ানক সংকট ও উভয় সংকটে নিপতিত বুর্জোয়াদের। ফলে, নানান রকমের বিরোধ-বৈরীতার আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা বুর্জোয়ারা এই সব স্বসৃষ্ট নানান বাঁধা ও প্রতিবন্ধকতা উতরাতে যেমন ব্যর্থ হচ্ছে তেমন নানান রকমের আর্থিক সংস্কার করা সত্ত্বেও মন্দা ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে মন্দা ঠেকানোর জন্য গঠিত খোদ আই এম এফ।

উল্লেখ্য, আই এম এফ প্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয়বারে মন্দার শুরু হয় ২০০৮ সালে। এই ভয়ানক মন্দায়- বহু বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানের দেউলিয়া হওয়া; বেকারত্বের হার বাড়া; খোদ বৃটেনে টানা কয়েকদিনের নৈরাজ্যিক অবস্থা ; ১% বনাম ৯৯% এর ভুয়া আন্দোলন, তথাকথিত 'আরব বসন্ত'; মধ্য প্রাচ্যে গৃহ যুদ্ধ সমেত নানান যুদ্ধ; নজিরবিহীন উদ্বাস্তু সমস্যা; যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার বা যুক্তরাষ্ট্র ও

চীনের বিরোধ ও উত্তেজনা বৃদ্ধি; এশিয়া,আফ্রিকা, ইউরোপ সমেত বিভিন্ন মহাদেশে নানান রকমের জংগীবাদের ও উগ্র জাতিয়তাবাদের বিষাক্ত থাবার বিস্তার; ভয়ানক হারে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি তবে আমেরিকার আধুনিক শিক্ষা পেশায় নিযুক্ত পেশাজীবীদের আন্দোলন এবং স্পেন-ফ্রান্স, ইটালী-গ্রীসে সহিংস শ্রমিক আন্দোলন সমেত ইউরোপের ২৮ দেশের ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন; এবং সর্ব শেষ ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বৃটেনের বের হওয়ার মতো ঘটনাদি সংঘটিত হয়েছে।

অতঃপর, উল্লেখিতরূপ দুর্যোগ, দুর্দশা ও দুরাবস্থা সমেত বিদ্যমান মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রের শাসক প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন পুঁজিতন্ত্রকে সচল রাখতে অক্ষম হয়ে সামাজিক অগ্রগতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সমাজ শাসনে অযোগ্য হয়েছে, তেমনি পুঁজিপতি শ্রেণীর পৌনঃপুনিক ব্যর্থতা, অযোগ্যতা ও অক্ষমতায় দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীও স্বীয় মুক্তির বিষয়ে অধিকতর মাত্রায় চিন্তা করতে বিশেষত আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সুবাদে এই সব দুর্যোগ ও দুদর্শার কারণ সমেত জগত ও জীবের উদ্ভব, মানব সমাজের ইতিহাস এবং পুঁজি, পুঁজিতন্ত্র ও পুঁজিতন্ত্রের পরিণতি বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব-সূত্র ও তথ্য অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান সহজে লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

অতঃপর, কেবল শোষিত হওয়াই নয়, বরং মুক্তি ও স্বাধীনতার নামে বারে বারে প্রতারিত,প্রবঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক শ্রেণীর যে অংশ সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরিখে ইতিহাসকে বিবেচনা করবে তারাই উদ্যোগী হয়ে স্বীয় শ্রেণী মুক্তি সাধনে পুঁজিতন্ত্র বিনাশে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে শ্রমিকদের একটি পার্টি গড়ে তুলবে।

উল্লেখ্য, প্রথম আন্তর্জাতিক গঠিত হওয়ার প্রেক্ষাপট তৈরী করেছিল পুঁজিপতি শ্রেণী। কিন্তু, তখনকার তুলনায় আজকের বুর্জোয়া শ্রেণী আরো অনেক অনেক বেশী সংকটাপন্ন ও বিপন্ন বলেই এই বিপন্ন তবে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী নিজেরাই নিজেদের সংকট তৈরী করতেই থাকবে আর আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির সুবাদে তা জানতে ও প্রত্যক্ষ করবে দুনিয়ার শ্রমিকেরা। আবার, এই শ্রেণীর সংকট যেমন শ্রমিকদেরেকেও সংকট ফেলে তাই, সংকটমোচনে প্রথম আন্তর্জাতিক গড়ে উঠার প্রেক্ষাপটের মতো অবস্থাকে অনুকুলভাবে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকদের একটি বিপ্লবী গড়ে তুলতে ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে সচেতন শ্রমিকেরা। তবে, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে একটি মুক্ত মানব জাতির মুক্ত সমাজ- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক শ্রেণীর এরূপ একটি বিপ্লবী পার্টি গড়া, বিকাশ ও পার্টির সামগ্রীক ক্রিয়া কর্মে অংশ গ্রহণ করবে বটে অশ্রমিক বা বুর্জোয়াদের একটি অংশ যারা- ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি এবং তত্ত্ব ও তথ্য-

উপাত্তে সমৃদ্ধ হয়ে পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল ও সহমত পোষণ করে ইতিহাসের অগ্রগতির স্রোত তথা সমাজ পরিবর্তনের ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে অনিশ্চয়তার নিশ্চিত সমাজ, দুনিয়ার সকল দুস্কর্মের হোতা ও ভান্ডার এবং অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের সৃষ্ট তাবৎ অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা,দুর্ভোগ,অশান্তি ও অসংখ্য শৃংখল হতে মুক্তি ও স্বাধীনতাকামি এবং অনাবিল শান্তি প্রত্যাশী।

উল্লেখ্য, প্রথম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তজার্তিকের প্রধান প্রধান নেতারা পুঁজিতন্ত্রী সমাজ প্রতিস্থাপনের ১ম আন্তর্জাতিকের লক্ষ্য ও নিয়ামাবলী অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও অস্বীকার করে পুঁজিতন্ত্রী স্বার্থের সেবা এবং পুঁজিতন্ত্রকে রক্ষা করতে তথাকথিত " জাতীয় মুক্তির" বা কথিত " জাতি সমূহের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার" এর রাজনৈতিক লাইন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের লন্ডন কংগ্রেসে (১৮৯৬) গ্রহণ করার মাধ্যমে দুনিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যের পথে কেবল প্রতিবন্ধকতাই তৈরী করেনি বরং শ্রমিক শ্রেণীকে দেশ-জাতিতে যেমন ভাগ-বিভাগ করার অপঃপ্রয়াশ চালিয়েছে তেমন শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী পরিচয় ভুলিয়ে দিতে ও বিবাদমান বুর্জোয়াদের স্বার্থে শ্রমিক শ্রেণীকে ব্যবহার করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী স্বার্থ অস্বীকার ও ভুলে যাওয়ার বিহীতাদি সাধনের রাজনৈতিক দুস্কর্ম সংঘটনের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানকে কেবল অবজ্ঞা, অস্বীকার করাই নয় বরং, কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আড়াল ও গোপন করার অপচেষ্টা করেছে। এই সব নেতারাই পরবর্তীতে ফ্রান্স, জার্মান ইত্যকার দেশে বুর্জোয়াদের সরকারে যোগ দিয়েছে অথবা বিপন্ন বুর্জোয়াদের সেবা করতে নিজেরাই সরকার গঠন করেছে।

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতা রোজা লুক্সেমবার্গ অবশ্য এই প্রতারণার বিরোধীতা করেছিলেন। কিন্তু, তিনিও ঐতিহাসিক দাস বিদ্রোহের নেতা স্ফার্টাকার্সের নাম যুক্ত করে পার্টি গঠন করে কার্যত দাস বিদ্রোহ আর পুঁজিতন্ত্র বিনাশী কমিউনিস্ট বিপ্লবের মধ্যে ফারাক করতে যেমন খানিকটা ব্যর্থ হয়েছেন, তেমন "স্বঃতস্ফূর্ত বিপ্লবের" অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য বা মতবাদ তথা "রাজাইজম" হাজির করে মূলত ঐ রাজনীতির অক্ষমতা ও অগ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করলেন নিজের জীবন দিয়ে। উল্লেখ্য, রোজাকে চরম বর্বরতায় ও নৃশংসভাবে খুন করে লাশ গুম করেছিল তারই এক সময়ের রাজনৈতিক সাথী তবে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক নেতাদের দ্বারা গঠিত জার্মানীর সরকার।

আবার, কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট বিপ্লব, সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম এমনকি পুঁজিতন্ত্র ইত্যকার বিষয়ে ভুয়া, অসত্য, উদ্দেশ্যপূর্ণ রটনা ও

বানোয়াটি রাজনৈতিক প্রচারণা চলে আসছে প্রধানত ১৯১৭ সাল হতে লেনিনবাদ, এবং লেনিনবাদী ক্যাম্পের মাও চিন্তা, হোচিমিন চিন্তা, ট্রটস্কিবাদ, হোক্সাবাদ, স্তালিনীয় চিন্তা, পল-পটীয় চিন্তা, জুসে, নকশাল, লেপ্ট কমিউনিজম ইত্যকার নানান ঘরণার লেনিনবাদী মোড়ল, লেনিনবাদের সুবিধীভোগী ও লেনিনবাদ সমেত উল্লেখিত নানান চিন্তার প্রতি অন্ধ অনুগত বা মহা গুরু লেনিন ও তার বিশিষ্ট শিষ্য তথা নানান দেশের নানান লেনিনবাদী দলের নানান স্তরের খলিফা তথা নেতা-পাতি নেতাদের প্রতি সরল বিশ্বাসী নানান ব্যক্তি কর্তৃক। এরাই ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ সমেত নানান দুস্কর্ম সংঘটিত করেছে সমাজতন্ত্রের নামে। এমনকি এই সব লেনিনবাদী মোড়ল-মাতুব্বর, ও খলিফারা তাদের বহুদিনের সংগী-সাথীদেরকে নৃশংসভাবে খুন-জখম করতে লজ্জিত হয়নি। এই খুনিরা " কমরেড" হিসাবে পরস্পরকে সম্বোধন করে একটি উকৃষ্ট মানের মধুর সম্পর্ক প্রকাশক "কমরেড" শব্দটিকে কেবল দূষিতই করেনি বরং, নিষ্ঠুর, পৈশাচিক ও হিংস্র খুনিদের উপাধি বা তকমা হিসাবে সাধারণ্যে প্রতিস্থাপন করে এই সুন্দর শব্দটির আবেগময়ী মাধুর্যও নষ্ট করেছে। তবে, " মহামতি" লেনিন ও তার বিশিষ্ট শিষ্যদের প্রতি সহজ-সরল বিশ্বাসী এক শ্রেণীর বোকারাও লেনিনবাদ সমেত লেনিনবাদের ক্যাম্পের নানান ঘরণার ভুয়া-মিথ্যা রটনা ও প্ররোচনায় প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত হয়ে জীবন পাত করেছে এবং এখনো তা করে যাচ্ছে। এই সরল বিশ্বাসীরাই ঐ সব হিংস্র-ভন্ড তথা স্বার্থান্বেষী নেতাদের বহু দুস্কর্মের গুঁটি। অথচ, এরা সমাজতন্ত্রের প্রতি মোহাচ্ছন্ন তাই, লেনিনের রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রকে এরা গুরুকুলের বানোনা মতবাদ অনুযায়ী সমাজতন্ত্র বিবেচনা করে কথিত সমাজতন্ত্রের পরবর্তী ধাপ বা সমাজতন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠিত সমাজকে শ্রেণীহীন-রাষ্ট্রহীন সমাজ তথা কমিউনিস্ট সমাজ হিসাবে গণ্য করে আসছে।

অথচ, এই সরল বিশ্বাসীরা নেতাদের বচনে বিশ্বাসী বলেই যেমন গুরুদের মতবাদের প্রতি প্রশ্ন তুলে চিন্তা করেনি যে, সমাজতন্ত্রকে বিলুপ্ত করে রাষ্ট্রমুক্ত-শ্রেণীমুক্ত কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠায় লেনিন ও লেনিনবাদী খলিফাদের গঠিত রাষ্ট্রগুলো বিলীন ও বিলুপ্তকরণের কোনো প্রকার বিধি-বিধান কি ঐসব কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো গঠনের কাঠামোপত্র অর্থাৎ সংবিধান, য'দ্বারা ঐ রাষ্ট্রগুলো গঠিত হয়েছে তাতে আদৌ সন্নিবেশিত হয়েছে ? বরং স্তালিন সহ কেউ কেউ বলেছে যে, তাদের রাষ্ট্রগুলো চিরন্তন আর খোদ কিম তো তার রাষ্ট্রের " ইটার্নাল" প্রেসিডেন্ট।

অথবা, খোদ লেনিনের পার্টি সমেত অপরাপর লেনিনবাদী পার্টিগুলো যে, লেনিনবাদের বদ উদ্দেশ্য হাসিলে মার্কস-এ্যাংগলেসদের রচনাসমুহের লেনিনীয় সংস্করণ হিসাবে সাজিয়ে মার্কস-এ্যাংগলেসদের রচনাসমূহ পুনঃরচনা করে মার্কসদের রচনাগুলোকে দূষিত,বিকৃত করে কার্যত লেনিনীয় সংস্করণ বাজারজাত করেছে। অতঃপর, মার্কস-এ্যাংগেলেসের নাম যুক্ত সেই সব জাল ও ভূয়া বই-পুস্তকেও কি সমাজতন্ত্রের পরবর্তী ধাপ হিসাবে কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রের পরবর্তী সমাজ হিসাবে কমিউনিজমকে চিহ্নিত-নির্ণিত করে শ্রেণী শোষণের শক্তিশালী হাতিয়ার রাষ্ট্র এবং রাজনীতি, এবং অগণন পণ্যের পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতির মূল মূল উপাদান- পণ্য উৎপাদন, পুঁজি গঠন, কেনা-বেচা, মজুরি দাসত্ব, শোষণ ইত্যকার বিষয়াদি সমেত লেনিন-মাওদের মতো "মহামতি" বা " মহান শিক্ষক" বা কিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মতো কোনো " ইটার্নাল" প্রেসিডেন্ট সমেত এক দংগল পরজীবী নিয়ে লেনিনীয় সমাজতন্ত্র, যা গঠিত হবে আবার প্রত্যেক দেশের আলাদা-আলাদা সমাজ যদিচ, তা কল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বৈ সত্য নয় তবুও, দেশ ভিত্তিক সেই মিথ্যা-মিথ্যে সমাজের স্বীকৃতিতে এবং সেই সব ভুয়া সমাজগুলোর তথা প্রত্যেক দেশের আলাদা আলাদা সমাজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও সেখানকার কথিত সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই ভুয়া সমাজ পরিবর্তনে শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করে কথিত জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদেরকে মিত্র গণ্যে " বিপ্লবী" শ্রমিক এবং " প্রতিক্রিয়াশীল" কৃষকের তথাকথিত শ্রমিক-কৃষক রাজ কায়েমের মাধ্যমে কথিত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং পণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে মজুরী দাসদেরকে শোষণ করে পুঁজি গঠন ও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাদিতে এমন কি কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটন করে সেই কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহামতি লেনিন ও মহান শিক্ষক মাওদের চিন্তা ও দর্শনের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি কার্যকরী করে কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনগণকে লেনিন-মাও বা হো-চি, কিমদের চিন্তায় ও শিক্ষায় শিক্ষিত করে কমিউনিজমের উপযুক্ত মানুষ তৈরী করে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠা করার বিষয়াদি আদৌ বিবৃত হয়েছে?

অথবা, মার্কস-এ্যাংগলেসদের নামাকিঙত এই সব বিকৃত রচনাবলীতেও কি বিবৃত নয় যে, পুঁজিতন্ত্র একটা বৈশ্বিক উৎপাদন প্রণালী। তাই, কোনো একক দেশে পুঁজিবাদকে প্রতিস্থাপন যেমন করার সুযোগ নাই, তেমন কোনো একক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব; অথবা, পুঁজিতন্ত্রী সমাজে বিপরীত স্বার্থের দুই বিপরীত মুখি অবস্থায় দন্ডায়মান দুটি শ্রেণীর অর্থাৎ শ্রমিক ও মালিক শ্রেণীর বিরোধের পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র যা বেচা-কেনা মুক্ত, তাই, পণ্য

উৎপাদন মুক্ত বলেই পুঁজি মুক্ত সুতরাং শোষণ মুক্ত একটি সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।

অথবা, মার্কসদের নাম সম্বলিত উল্লেখিত বই পুস্তকে কি বিবৃত নয় যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে সকল প্রকার বৈরীতা, বৈষম্য মুক্ত একটি সমাজ তাই সমাজতন্ত্রে সকলেই সমান, সুতরাং সমাজতন্ত্রে কোনো মোড়ল, মাতুব্বর বা রাজনৈতিক শিক্ষাদাতা বা নির্দেশদাতা বা গুরু নাই বলেই কমিউনিজম সকল প্রকার দাসোচিত চিন্তা মুক্ত স্বাধীন ও মুক্ত মানুষদের সমাজ।

তদপুরি, ঐসব বইতেই কি লিখিত নাই যে, প্রত্যেক মানুষ যে সমান এই কথা যারা বুঝে না,বা স্বীকার করে না তারা এমনকি " পুঁজি' বুঝতে অক্ষম, আর যারা পুঁজি বুঝতে অক্ষম তাদের পক্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে অংশী হওয়াতো সম্ভবই নয় এমন কি, সমাজতন্ত্র বুঝাও এক অবান্তর বিষয়।

অথবা, ঐসব বিকৃত পুস্তকাদিতে কি বিবৃত নাই যে, পুঁজিতন্ত্রই হচ্ছে ইতিহাসের শেষ শ্রেণী বিভক্ত সমাজ; অথবা, এটাও বিবৃত নাই যে পুঁজিপতি মানেই শোষক তাই শোষিত শ্রমিকের শত্রু বৈ মিত্র নয় কোনো পুঁজিপতি; অথবা, বিকৃত বইগুলোতে কি বিবৃত নয় যে, কৃষক কেবল সংরক্ষণবাদীই নয় বরং প্রতিক্রিয়াশীল; অথবা, মার্কস-এ্যাংগেলস দুজনেই কি কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের একটি ভূমিকায় বিবৃত করেনি যে, তখনকার দিনে সমাজতন্ত্র আর কমিউনিজম বলতে যা বুঝাত তার মধ্যে সাহেবীপনার সমাজতন্ত্র নয় বরং সংগ্রামী শ্রমিকদের কমিউনিস্ট বুঝাত বলেই তারা উল্লেখিত পুস্তটির নাম হিসাবে কমিউনিস্ট পছন্দ করেছেন, আবার মার্কসের জীবদশায় এ্যাংগেলস কি "সমাজতন্ত্র : ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক" বইটি লিখে মার্কস কর্তৃক সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞান আবিস্কার এবং পুঁজিতন্ত্রের স্ববিরোধীতার ফলাফল-শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্র বিষয়ে ঐ পুস্তকে যেসব বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সূত্রায়ন করেছেন তা কোনো মতবাদ বা মার্কসবাদের ভিত্তিতে নয় বরং তা করেছেন বটে সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরিখে এবং এই বইয়ের নামের প্রথম অংশ কমিউনিজম না লিখে সমাজতন্ত্র লিখেছেন বলে খোদ মার্কস আপত্তি করেনি; এবং তাদের রচিত অথচ, লেনিনবাদীদের দুষিত ও বিকৃত বই পুস্তকে কি বিবৃত নয় যে, শ্রমিকদের মুক্তি কেবল শ্রমিকদেরই কাজ বা পুঁজিতন্ত্রের এই যুগে কেবলমাত্র শ্রমিক শ্রেণী হচ্ছে প্রকৃত বিপ্লবী শ্রেণী?

অথবা, লেনিনবাদীদের জালিয়াতিতে মার্কসদের বিকৃত বইগুলোতেও কি বিবৃত নয় যে, উপনিবেশিকতার নীতি ছিল বিপ্লবী বুর্জোয়াদের অনুশীলত একটি নীতি যা ছিল বুর্জোয়া অর্থনীতি বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই নীতির কার্যকরণেই বুর্জোয়ারা সমগ্র দুনিয়াকে পণ্য উৎপাদনী প্রণালীর অধীনস্ত

করে দুনিয়াব্যাপী একটি পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছে। তাই, কোনো একক দেশে পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ ও বিলোপ সাধন করা যেমন সম্ভব নয় তেমন, একা একটি দেশে সমাজতন্ত্রও প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

অতঃপর, মাওসেতুং যে শত্রু-মিত্র নির্ধারণে চীনা সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ করলেন এবং তাবৎ লেনিনবাদী মোড়লরা যে, যে দেশে বাস করে সেদেশের সমাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রত্যেক দেশের সমাজকে আলাদা সমাজ হিসাবে চিহ্নিত করে এবং উপনিবেশিকতার নীতি পরিত্যাক্ত হওয়ার পরও বানোয়াটিমূলে উপনিবেশিকতার নানান ধরণ উল্লেখ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রত্যেকে দেশে আলাদা আলাদা নীতি-কৌশল গ্রহণ করছে তাও মার্কসদের বিকৃত বই-পুস্তকে লিখিত হয়েছে কি? এমনকি, এরা লেনিনবাদী চশমা দ্বারা দুনিয়া দেখে বলে এটাও চিন্তা করতে অক্ষম যে, আই এম এফ প্রতিষ্ঠা কালে সদস্য সংখ্যা ৫১ আর হালে ১৯৮; অতঃপর তখন কি দুনিয়ায় ৫১ টি আর হালে ১৯৮ টি সমাজ বিদ্যমান? আর কমিউনিস্ট বিপ্লবের শত্রু-মিত্র নির্ধারণ? মার্কসদের বই-পুস্তকও যদি কেউ না পড়ে থাকে, তবু আই এম এফ প্রতিষ্ঠার এত্তো বছর পরও কি তারা ভাববে না যে পুঁজিতন্ত্র একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা বলেই পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় অমন একটি বৈশ্বিক সিন্ডিকেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যে শ্রমিক যে পুঁজিপতির নিকট তার শ্রম শক্তি বিক্রি করে পুঁজি গঠনে পণ্য উৎপন্নে শ্রম শক্তির ঐ ক্রেতাই ঐ মজুরের শোষক বলে পুঁজিপতি হচ্ছে মজুরের শত্রু আর সমগ্র দুনিয়ার পুঁজিপতি শ্রেণী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর শত্রু। এই শ্রেণী বিশ্লেষণ এমনকি, কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারেও বিবৃত হয়ে কৃষকদেরকে প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়নি?আর যদি কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহার সমেত মার্কসদের বিকৃত রচনাবলীতেও এসব বিষয়াদি বিবৃত থাকে তবে মার্কসদের রচনাবলীর এদসংক্রান্ত বিবৃতিগুলোকে ভুল ও ভ্রান্ত হিসাবে চিহ্নিত করে লেনিন, মাও বা অপরাপর লেনিনবাদী মোড়ল-মাতুব্বরা তদার্থে আবশ্যকীয় বই-পুস্তক রচনা না করে কি কমিউনিস্ট বিপ্লবের শত্রু-মিত্র নির্ধারণে এসব বই-পুস্তক, নিবন্ধ কি লিখতে পারেন মার্কসের নাম ব্যবহারকারী অথচ মার্কস বিষয়ে মিথ্যা ও ভুয়া বক্তব্য প্রদানকারী লেনিন,মাও, ট্রটস্কি, স্তালিন, কিম, হোচি প্রমূখ লেনিনবাদী মোড়লরা?

এই সরল-সহজ বিশ্বাসী সমাজতন্ত্রীরা এটাও কখনো চিন্তা করেনি বা করে না যে, কমিউনিস্ট লীগ কি "বৃদ্ধ পুঁজিতন্ত্র" বিলোপনে গঠিত হয় নি অথবা, প্রথম আন্তর্জাতিক যা গঠিত হয়েছিল মার্কসের প্রস্তাবনার ভিত্তিতে তা কি পুঁজিতন্ত্র বিলোপনে দুনিয়ার শ্রমিকদের একতাবদ্ধ করা বৈ কৃষক বা দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াদের একতাবদ্ধ করণে কোনো কর্মসূচি বা তেমন প্রস্তাব গ্রহণ বা

কোনো কৃষক বা দেশপ্রেমিক বুর্জোয়াকে সদস্যপদ দেওয়ার বা কোনো দেশ বিশেষের রাষ্ট্রিক ক্ষমতা দখলের নীতি গ্রহণ করেছিল?

অতঃপর, কথিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের বিশ্বাসঘাতক, প্রতারক ও ভন্ড নেতাদের কমিউনিস্ট আন্দোলন বিরোধী জাতীয় মুক্তির রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি খোদ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যত স্বয়ং বিলুপ্তি। কিন্তু, 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের' রাজনৈতিক লাইন-'জাতীয় মুক্তির' ধারায় গঠিত বলশেভিক পার্টির এবং বলশেভিক পার্টিকে ভিত্তি ধরে বা লেনিনবাদী মতাদর্শে গঠিত পার্টিগুলোর অনুরূপ রাজনৈতিক লাইন এবং রাষ্ট্রীয় পুঁজিতন্ত্রের রাজনীতি অনুশীলনে সুবিধা হয়ে আসছে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর আর নানান ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি সমেত শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘটিত করে যাচ্ছে অগুণতি দুস্কর্ম।

প্রকৃত পক্ষে লেনিনবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর বিপক্ষে তথা সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তবে, ক্ষয়িষ্ণু পুঁজিতন্ত্রের স্বপক্ষে এবং প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণীর অনুকলে এক বিষাক্ত বটিকা বিশেষ। তাই, লেনিনবাদী মতাদর্শের এই বিষাক্ত বটিকা সেবনকারীদের সকল কর্ম কার্যত শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তথা সমাজতন্ত্রের বিপক্ষের দুস্কর্ম। তাই, লেনিনবাদীদের অগুণতি দুস্কর্মের ইতিহাস হচ্ছে মূলত চরম প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত ক্ষয়িষ্ণু তথা মরণাপন্ন পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষার ইতিহাস। **সুতরাং,লেনিনবাদীদের সকল দুস্কর্ম কেবল সমাজতন্ত্র বা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের বিপক্ষেরই নয় বরং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে ইতিহাসের দৃশ্যপট হতে আড়াল ও গোপন করার এক হীন অপচেষ্টার কলংকজনক ইতিহাসও কেবল নয় বরং তদোদ্দেশ্যজাত এক কদাকার ইতিহাসও বটে।**

আইডিয়া বা মতাদর্শ নয়, বরং কমিউনিজম হচ্ছে বিজ্ঞান। কমিউনিস্ট সোসাইটিও হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ। কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিষ্ঠায় দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণের কমিউনিস্ট পার্টি হচ্ছে একটি বিজ্ঞান ভিত্তিক পার্টি। তাই, এটি একটি বৈজ্ঞানিক পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যগণ তথা কমিউনিস্টরাও হচ্ছে বিজ্ঞানী। তাই, কমিউনিস্ট আন্দোলন হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক আন্দোলন, বিজ্ঞানীদের আন্দোলন। সুতরাং, বিজ্ঞান বৈ কোনো মতবাদ বা মতাদর্শ বা আইডিয়া প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যেমন বৈজ্ঞানিক আন্দোলন নয় তেমন সমাজ পরিবর্তনের নামে কোনো আইডিয়া বা মতাদর্শ ভিত্তিক আন্দোলনও কমিউনিস্ট আন্দোলন নয়।

আবার, আই সি সি সহ নানান সংগঠন যারা লেনিন, ট্রটস্কি, স্তালিনদের নানান মতবাদ ও নানান কাজের বিরোধীতা করেও বলশেভিক পার্টির রুশ রাষ্ট্র

ক্ষমতা দখলের সামরিক ক্যুকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলে কবুল করে কমিউনিস্ট আন্দোলন করছে বলে দাবী করছে তারা যেমন কমিউনিস্ট আন্দোলনকারী নয়, তেমন জন্মসূত্রে বুর্জোয়া বলশেভিক পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টি বিবেচনা করে নানান রাজনৈতিক কার্যক্রম করছে যেসব পার্টি, সেসব কোনো পার্টি বা সংগঠনই কমিউনিস্ট আন্দোলন করছে না। কারণ, কমিউনিস্ট বিপ্লব যেমন কতিপয় সৈনিকের নয় বরং লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের এবং কেবলমাত্র শ্রমিকদের সম্মিলিত কাজ তেমন বলশেভিক পার্টি জন্মকালীন ঘোষণামূলেই এক প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিতন্ত্রী পার্টি বৈ কিছু নয়। অতঃপর, এই পার্টির কোনো কাজ যেমন কমিউনিস্ট ক্রিয়া নয় তেমন এই পার্টির অনুসারী বা অনুগামী কোনো পার্টিও কমিউনিস্ট আন্দোলনের পার্টি নয়।

মার্কস-এ্যাংগেলসদের পূর্বেতো নানান কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী ও নৈরাজ্যবাদী ছিল বটেই এবং তাদের সমসাময়িক কালে স্ব-স্বীকৃত " ভাব বিলাসী আইডিয়ালিস্ট"

(" sentimental idealist;" Recollections on Marx and Engels- Mikhail Bakunin- https://www.marxists.org/reference/archive/bakunin/works/various/mebio.htm) বাকুনিনের "নৈরাজ্যবাদ" সহ নানান মতাদর্শী বা আইডিয়ালিস্টের সমাজতন্ত্র বিষয়ে নানান রকম আইডিয়া বা মতাদর্শ বা মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। সেসব মতবাদের কোনো কোনো ধারার তৎপরতা এখনো নিবু নিবু প্রদীপের মতো ক্রিয়াশীল। কিন্তু, এসবের কোনোটিই যে সমাজতন্ত্রের পক্ষের নয় তাতো মার্কস-এ্যাংগেলস দুজনেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সূত্র দিয়ে প্রমাণ করেছেন। কাজেই, সেই সব অবৈজ্ঞানিক ধারার কোনো আন্দোলন যে কমিউনিস্ট আন্দোলন নয় তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেনিনবাদ সহ বর্ণিত অপরাপর ধারার বাইরে ১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন নামে একটি সংগঠন। এরা মার্কস-এ্যাংগেলসদের অনেক বক্তব্যকে সঠিক মনে করলেও কমিউনিস্ট বিপ্লব বিষয়ে মার্কস-এ্যাংগেলসদের সামগ্রীক তত্ত্বায়ন ও সূত্রায়ন বিবেচনায় নিতে অসম্মত হয়ে শ্রমিক-মালিকের বিরোধ তথা শোষক-শোষিতের বিরোধের শীর্ষ বিন্দু হিসাবে কমিউনিস্ট বিপ্লব নয় বরং শান্তিপূর্ণ পন্থায় ভোট বিপ্লবের মাধ্যমে সংখ্যাধিক্য ভোটারের মতামতে দেশে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি-কৌশল গ্রহণ করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিহাসের অবচেতন হাতিয়ার হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণী নিজেই নিজের ধ্বংস বিধানকারী-শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম দেওয়া সহ পুঁজিতন্ত্র বিনাশ ও বিলোপের সব ধরণের শর্ত ও ভিত্তি এবং বীজ তৈরীতে বাধ্য হলেও পুঁজিপতিরা এতোটা বোকা বা যুক্তিশীল ও উদার নয় যে,তারা জেনে-বুঝে নিজেরাই নিজেদের মরণ ফাঁদের যাবতীয় বিহীতাদি নিজেদের সংবিধানে সন্নিবেশিত করবে। তাছাড়া, খোদ রাষ্ট্র সমেত পুঁজিতন্ত্রকে ভোটাভোটির মাধ্যমে বিলীন করার কোনো বিধান কোনো রাষ্ট্রের সংবিধানে নাই। তবু,ভোটাভোটির মাধ্যমে এবং ভোটারদের দ্বারা দেশে দেশে কথিত শান্তিপূর্ণ পন্থায় তথাকথিত শান্তিপূর্ণ কমিউনিস্ট বিপ্লব সাধনে 'বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন' এর নীতি-কৌশল নিতান্তই এক অবাস্তব বা স্বপ্ন বিলাসিতা বৈ কিছুই নয়। তাই, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের এই রূপ স্বপ্ন বিলাসিতার কার্যক্রম কমিউনিস্ট আন্দোলনতো নয়ই, উপরন্ত কমিউনিস্ট আন্দোলন ও কমিউনিস্ট বিপ্লব বিষয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানোর নামান্তর।

সুতরাং, **১৮৯৬ সাল হতে কমিউনিস্ট পার্টিতো নয়ই বস্তুত কমিউনিস্ট আন্দোলনও পৃথিবীতে অনোপস্থিত।**

অথচ, কমিউনিজমের লক্ষ্যে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একতাবদ্ধকরণে শ্রমিক শ্রেণীর একটি পার্টি যেমন বিকল্পহীন শর্ত তেমন এক ঐতিহাসিক আবশ্যকতা।

সুতরাং, পুঁজিতন্ত্র বিনাশের মাধ্যমে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য একতাবদ্ধ করতে একটি কমিউনিস্ট পার্টি তথা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি গঠনে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে পুনর্গঠন করা এক ঐতিহাসিক আবশ্যকতা।

অতঃপর, কমিউনিস্ট আন্দোলন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্যে সহযোগিতায় এবং তদ্বিষয়ে আবশ্যকীয় ও সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব, সূত্র, তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি সমেত লেনিনের সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ লেনিনবাদী রাষ্ট্রগুলোর দুস্কর্মাদি সহ ঐতিহাসিক বিষয়াদি অনুসন্ধান, সংগ্রহ, এবং সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানের নিরীখে সেসবের পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, এবং তদভিত্তিতে মূল্যায়িত, সূত্রায়িত ও ব্যাখ্যাত আবশ্যকীয় বিষয়াদি প্রকাশ, প্রচার ও সংরক্ষণের জন্য গঠিত হয়েছে **ইনফরমেশন সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স ফ্রিডম**।

অতঃপর, আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংগঠনের আওতা ও কর্তৃত্বে বৈশ্বিকভাবে একতাবদ্ধ হতে বাধ্য হলেও সমাজের অগ্রগতি সাধনে অযোগ্য ও অক্ষম এবং হাজারো সমস্যা- সংকট, বিরোধ-বৈরীতা এবং আন্তঃকলহ ও আন্তঃবিবাদে জর্জরিত, বিধ্বস্ত,বিপন্ন এবং বহুধাভাগে বিভক্ত পুঁজিপতি

শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই করার যোগ্যতা, উপযুক্ততা ও সক্ষমতা অর্জন করবে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে শ্রেণী হিসাবে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণী, আবার এই সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীই একটা ভয়ানক মন্দার কালে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন পুঁজিপতি শ্রেণীর বর্ণিত দুরাবস্থা ও দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর জয়লাভের পরিস্থিতিগত অনুকুল সুবিধা কাজে লাগাতে সক্ষম হবে।

অতঃপর, পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর লড়াই যত বাড়বে ততই দুনিয়ার শ্রমিকেরা অসহ্য ও অসহনীয় পুঁজিতন্ত্র বিলোপে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হবে। ফলে- সারা দুনিয়ার শ্রমিক আন্দোলন তথা পুঁজিতন্ত্র বিরোধী ও বিনাশী আন্দোলন সংগ্রথিত, সমন্বিত, কেন্দ্রীভূত,সুসংহত, বেগবান, অধিক হতে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন, এবং দ্রুত হতে দ্রুততর গতি সম্পন্ন হবে।

তবে, কখনো কখনো শ্রমিকদের আন্দোলনে বিপর্যয়ও দেখা দিতে পারে নানাবিধ কারণে। তবু, শেষ বিচারে শ্রমিক শ্রেণী জয় লাভ করবে, সফল হবে। কারণ, শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে পাল্লাটা ভয়ানক রকমের ভারী। কারণ, পৌনঃপুনিক মন্দায় পুঁজিপতি শ্রেণী কেবল বিপন্ন ও বিধ্বস্তই নয় বরং মন্দার কবল হতে রেহাই পেতে অক্ষম পুঁজিপতি শ্রেণী নিজে যেহেতু পণ্য উৎপন্নে অযোগ্য ও অক্ষম সেহেতু শ্রমিক শ্রেণী পণ্য উৎপন্ন না করলে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্যাদি উৎপন্নেও এই পরজীবী শ্রেণী অযোগ্য ও অক্ষম বিধায় পণ্য উৎপন্নে শ্রমিক শ্রেণীর অসহযোগিতা ও অস্বীকৃতিতে কেবলমাত্র বেঁচে থাকার আবশ্যকীয় পণ্যের অভাবে বুর্জোয়াদের মরা ছাড়া গত্যান্তর নাই হেতু স্বীয় যোগ্যতা ও নিজ ক্ষমতায় পরজীবী পুঁজিপতি শ্রেণী বেচেঁ থাকতেও অযোগ্য ও অক্ষম। তাই, পুঁজি উৎপন্নকারী মজুরী শ্রমিক ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী কেবল অচল নয়, বরং বাঁচতেও অক্ষম। আর, বিপরীতে পুঁজিপতি শ্রেণী ছাড়া বেঁচে থাকতেতো সক্ষমই বরং শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর বিনাশ ও বিলুপ্তি হচ্ছে পণ্য উৎপন্নকারী শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির শর্ত।

সংখ্যাগত ক্ষেত্রেও ৭.২ বিলিয়ন জনবসতির পৃথিবীতে প্রায় ২,২০০ বিলিওনিয়ার সমেত ১১ মিলিয়ন মিলিনিয়ারের বিপরীতে এখনই মজুরের সংখ্যা ৩.৫ বিলিয়নের বেশী। উপরন্ত, মূল্য উৎপন্ন সহ আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ও সচেতনভাবে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীর ক্ষমতা-যোগ্যতা ও স্বক্রিয়তা যে নানান সংকটে নিপতিত এবং হাজারো আন্তঃকলহ ও আন্তঃবিবাদে জর্জরিত-বিভক্ত বুর্জোয়া শ্রেণী অপেক্ষা কেবল তুলনাহীনভাবে বেশী হবে তাহাই নয়, বরং উভয় পক্ষের শক্তি ও ক্ষমতা যেমন তুলনা করার যোগ্য নয়, তেমন শ্রমিক শ্রেণী যদি সম্মিলিতভাবে কেবল পণ্য উৎপাদন বন্ধ করে দেয়, তা'হলেও পরজীবী বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

তবে, ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভূত হত্যা-খুন বা নির্যাতন-নিপীড়নের জঘন্যবোধ ও হিংস্র রীতি-নীতির সমাপ্তি সাধনকারী শ্রমিক শ্রেণী কাউকে সামাজিক প্রোডাক্ট ভোগ-ব্যবহারের সুযোগ হতে বঞ্চিত করা বা এসব সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত করার মাধ্যমে কাউকে হত্যা করার প্রশ্ন কেবল অবান্তরই নয়, বরং সমাজতন্ত্রে সকলেই থাকবে অত্যাধুনিক ব্যবহার্য সামগ্রী সহ বিশাল প্রাচুর্যের মধ্যে । তবে, বুর্জোয়া শ্রেণী যে কেবল শোষণ করার সুযোগই হারাবে তাহাই নয় বরং শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়ার যেমন বিলুপ্তি হয়ে পরিপূর্ণ মানবিক বোধ সম্পন্ন মানুষ হবে তেমন সমাজতন্ত্রে অস্তিত্ব থাকবে না শ্রমিক শ্রেণীরও। তাই,কোনো শ্রেণী বিশেষ নয় বরং সমাজতন্ত্রে শ্রম প্রদান করবে সক্ষম দেহের সকল ব্যক্তি। তবে, বেঁচে থাকার দৈনন্দিন সামগ্রী উৎপন্নের জন্য সকলকে কাজ করতে হবে খুবই স্বল্প সময়। তাই, সমাজতন্ত্রে সক্ষম দেহের কেউ যেমন অশ্রমিক নয় তেমন কেউ পরজীবীও নয়। তাই, শোষকদের প্রবর্তিত ও প্রচলিত প্রভু, শাসক, মালিক, নেতা, গুরু, শিষ্য, প্রার্থনা, পূঁজা, মিনতি, করুণা, আবেদন, মঞ্জুর, ইত্যকার আরো বহু শব্দের মতো 'মজুর' শব্দটিও যেমন হারিয়ে যাবে তেমন হারিয়ে গিয়ে ইতিহাসের যাদুঘরে ঠাঁই নিবে মানুষ হত্যা তথা সকল যুদ্ধাস্ত্রাদি এবং খুন, ধর্ষণ, যৌন হেনস্তা, ব্যাভিচার, অনাচার, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, অত্যাচার, ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থান্ধতা, ঝগড়া, মিথ্যা, প্রতারণা, ছলনা,ভনিতা, ভন্ডামি, জুচ্চোরি, অপরাধ, দন্ড, বিচার, রাজনীতি ইত্যকার শব্দ সমূহের মতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত এবং রাজনৈতিক পরিচিতির সকল শব্দ সমষ্টি সমেত লিংগ ভিত্তিক পরিচিতির নিমিত্তে সৃষ্ট নারী, পুরুষ, হিজড়া, সতীত্ব, কুমারিত্ব, সতী, অসতী, বেশ্যা, লুচ্ছামি, ছেলানীপনা, লুচ্ছা, কামিনী, রমনী, পতিতা, স্ত্রী, স্বামি, ইত্যকার যাবতীয় ফালতু শব্দ ভাষা হতে হারিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রে।

অতঃপর, রাজনীতি ও রাজনৈতিক পরিচয় মুক্ত সমাজ তথা মানুষদের সমাজ অর্থাৎ শোষণ ও পরজীবিতামুক্ত সমাজ- সমাজতন্ত্রে কর্মক্ষম সকলেই সামাজিক উৎপাদনী ক্রিয়া-কর্মে অংশ নিবে সচেতনভাবে ও স্বেচ্ছায় সমাজের সকলের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিজেরও সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতিতে। **সুতরাং, কেউ যেমন অলস ও অপচয়কারী নয় তেমন ভোগ-ব্যবহারে কেউ বারিত নয় সমাজতন্ত্রে।**

পুঁজির জন্মসূত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সাথে পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরোধ আর পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে মন্দা আর মন্দায় শ্রম বিরোধের প্রকটতর রূপ পরিগ্রহণ, এবং ব্যক্তিমালিকানার সংকোচন ও সামাজিক মালিকানার রাস্তা প্রস্তকরণ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে উৎপাদন সীমিতকরণ বা নিয়ন্ত্রণ করার

প্রক্রিয়া চলমান। সর্বশেষ, লেনিনবাদী মোড়ল জে. স্তালিন সমেত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী রাষ্ট্র ত্রয়ীর ৩ প্রধান নির্বাহীর কর্তৃত্বমূলে সকল রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও স্বকীয়তা কার্যত ক্ষুন্ন ও বিঘ্ন করে, মূলত প্যারী কমিউনের পরে ৩ সম্রাটের লীগ গঠন এবং পরবর্তীতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে রাষ্ট্রগুলো নানানভাবে জোটবদ্ধ হয়ে জোটের কর্তৃত্বে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে জোটের কর্তৃত্বের নিকট প্রতিটি জোটভুক্ত রাষ্ট্র কিঞ্চিত হলেও কতিপয় ক্ষমতা সমর্পন করার মাধ্যমে কেবলমাত্র কোনো এক পক্ষকে পরাজিত করেনি বরং অযোগ্য পুঁজিপতি শ্রেণী সমেত টিকে থাকতে অক্ষম 'ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী' (বিঃদ্রঃ-ফ্রান্সে গৃহ যুদ্ধ পুস্তকে মার্কস তখনকার রাষ্ট্রগুলোকে " ব্যভিচারী-সাম্রাজ্যবাদী" বলে চিহ্নিত করেছিলেন। কাজেই, লেনিনের পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায় নয় বরং মার্কসের মতে অন্তিম দশায় উপনীত রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে 'সাম্রাজ্যবাদ'।- লেখক) রাষ্ট্র গুলো বস্তুতই হেরে গিয়ে অন্তিম দশায় উপনীতি সাম্রাজ্যবাদী-ব্যভিচারী রাষ্ট্রগুলোর কর্তৃত্বসমূহ খোদ রাষ্ট্র সহ নিজেদের কর্তৃত্ব, স্বকীয়তা ও ক্ষমতা ক্ষুন্ন ও বিঘ্নিত করেছিল নিজেরাই বলে হেরে যাওয়া রাষ্ট্রগুলোর সেই ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব হানির ধারাবাহিকতা বজায় রাখাই কেবল নয় বরং কার্যতই রাষ্ট্রগুলোর ডিফাঙ্কট অবস্থা নিশ্চিত করে সেসব ডিফাঙ্কট রাষ্ট্রগুলোর নির্বাহী কর্তৃত্ব নির্বাচনে ভোটাভোটি থাকলেও কার্যত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মরণ নিশ্চিত করে বিশ্বময় আই এম এফের কতিপয় বেতনভোগী কর্মচারীর শাসন-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেও পুঁজিপতি শ্রেণী মন্দার কবল হতে রেহাই পায়নি।

কারণ- পুঁজিপতি শ্রেণী অপেক্ষা খোদ পুঁজি অধিকতর শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান। তাইতো, ব্যক্তি পুঁজিপতিরা যেমন নিজেরাই নিজের গলায় ফাঁস দিল তেমন পুঁজিপতি শ্রেণীর সেবক-পাহারাদার রাজনৈতিক মোড়ল ও রাষ্ট্রীক নির্বাহীগণ কেবল নিজেদের হাত পা-ই বাঁধেনি বরং নিজেদেরই প্রস্তুতকৃত আই এম এফের চুক্তিপত্র মূলে নিজেদের মাথা শুদ্ধ আই এম এফের কর্তৃত্বের নিকট বাঁধা রাখল। তাইতো, পুঁজিতন্ত্রকে সংরক্ষায় বেতনভুক কর্মচারীদের বৈশ্বিক শাসন-নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুঁজির মালিক হিসাবে পুঁজিপতি শ্রেণী স্বীয় অপ্রয়োজনীয়তা ও ক্ষতিকরতাই কেবল আবারো আরো প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান এবং বৈশ্বিকভাবে নিশ্চিত করেনি বরং পুঁজিপতিহীন সমাজ যে সম্ভব ও আবশ্যক এবং তা প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক শ্রেণী বৈশ্বিক ঐক্যের বিষয় এবং বৈশ্বিক সংগঠনের দৃশ্যমান নজির দুনিয়ার শ্রমিকদের সামনে অনিচ্ছাকৃতভাবে সরাসরি হাজির করেছে। অর্থাৎ বুর্জোয়া সমাজ শাসনে অক্ষম বুর্জোয়া শ্রেণী হাজারো আন্তঃশ্রেণী বিবাদ-বিরোধ সত্ত্বেও কেবল শ্রেণী হিসাবে টিকে থাকার জন্য

আই এম এফের কর্তৃত্বে যেমন বৈশ্বিকভাবে একতাবদ্ধ হয়েছে, তেমন শ্রমিক শ্রেণীকেও স্বীয় মুক্তি অর্জনে পুঁজিপতি শ্রেণীকে পরাজিত ও বিনাশিতকরণে বৈশ্বিকভাবে একতাবদ্ধ হওয়া বৈ বিকল্প নাই মর্মে আই এম এফ সহ নানান বৈশ্বিক সংগঠন ও বৈশ্বিক কাঠামোর প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান নজির স্থাপনে বাধ্য হয়েছে বিপদগ্রস্ত ও মরণ ব্যাধিতে আক্রান্ত পুঁজিপতি শ্রেণী।

অতঃপর, মহা মন্দায় সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বিপদাপন্ন, বিপন্ন, বিভক্ত, অতিমাত্রায় দুর্বল এবং স্বার্থান্ধতায় একচোখা তথা ভবিষ্যত পরিণতি বিষয়ে অন্ধ বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুক্তির লক্ষ্যে সংগঠিত, শক্তিশালী ও সচেতন শ্রমিক শ্রেণী তথা ইতিহাসের ভূত-ভবিষ্যত সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-সূত্র ও তথ্যসমূহ যথাযথভাবে অবগত ও নিজ শ্রেণী সহ মানব মুক্তির বিষয়ে সম্পূর্ণত অবহিত এবং জেনে-বুঝেই স্বীয় শ্রেণী মুক্তির সংগ্রামে স্বেচ্ছায় লিপ্ত একটি সচেতন শ্রেণী অর্থাৎ বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর বৈশ্বিক আন্দোলন যখন তার শীর্ষ বিন্দুতে পৌঁছবে তখন পরাজিত ও বিলুপ্ত হতে বাধ্য বটে ইতিহাসকে অস্বীকারকারী এবং চরমতম দুর্বল তবে ইতিহাসের নিয়মের অধীন চরম প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী।

বস্তুতপক্ষে, পুঁজি গঠন বা পুঞ্জিভূবনে পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ে দুনিয়ার শ্রম শক্তির ক্রেতা-বিক্রেতার বিরোধের শীর্ষ বিন্দু হচ্ছে কমিউনিস্ট বিপ্লব, যা পৃথিবীর এযাবৎকালে সর্ববৃহৎ ও সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপর যে বিপ্লবটি চাপিয়ে দিবে প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিপতি শ্রেণী আর সেই বিপ্লবটি সম্পাদন করবে বটে একা এবং একাকী শ্রমিক শ্রেণী। তাই, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলে ফিদেল-চে'দের মতো কতিপয় কথিত বীরের তথাকথিত বীরত্বপূর্ণ ভন্ডামি নয় বা পণ্য, পুঁজি, মজুরি, শোষণ ও পরজীবিতা অক্ষুন্ন রেখে রাষ্ট্রীয় পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মাও-হোচি মিন প্রমুখ ভন্ডদের কথিত মুক্তিযুদ্ধ নয় অথবা, দুনিয়াসেরা মিথ্যাবাদীদের অন্যতম লেনিনের পরিকল্পনায় বলশেভিক পার্টির অনুগত একগুচ্ছ সৈনিকের রাতের আধাঁরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করাও নয়,বরং শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণ-শাসন, দমন-পীড়ন ও নিয়ন্ত্রণের শক্তিশালী যন্ত্র-আই এম এফ, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি সকল ধরণের অস্ত্রাদি সমেত পুঁজিপতি শ্রেণী ও পুঁজিতন্ত্র বিলোপে কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে দুনিয়ার মিলিয়ন মিলিয়ন শ্রমিকের সম্মিলিত এক বলশীল ক্রিয়া।

উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্র একটি বিশ্ব ব্যবস্থা হলেও এটি একটি অসম ব্যবস্থা। তাই, সমগ্র দুনিয়ায় সমান তালে পুঁজিতন্ত্রী উন্নয়ন যেমন সাধিত হয়নি, তেমন দুনিয়ার সর্বত্র নয় বরং কতিপয় স্থানে পুঁজির কেন্দ্রীভবন সংঘটিত হয়েছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক বিলিয়নিয়ার ও মিলিনিয়ারের ঠিকানা

হচ্ছে আমেরিকা। নিশ্চয়ই, পুঁজি যেখানে কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেখানে যেমন পণ্য উৎপাদনের পরিমাণ বেশী তেমন তুলনামূলকভাবে শ্রমিকের সংখ্যাও বেশী এবং স্বভাবতই সেখানকার শ্রমিকেরা তুলনামূলকভাবে অভিজ্ঞ এবং সংগঠিত হওয়ার অনুকুল সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন। আবার, স্বাভাবিকভাবেই মন্দাও বারে বারে দেখা দেয় বটে বিশ্বের ঐসব অঞ্চলে যেখানে পুঁজি বেশী পরিমাণে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। তাই, পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর বিরোধের শীর্ষ বিন্দুর অর্থাৎ কমিউনিস্ট বিপ্লব শুরুর স্থানও হবে বটে পুঁজির কেন্দ্রীভূত অঞ্চল,হালের জি-৭ তথা- যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, জাপান, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইটালী এবং কানাডা। উল্লেখ্য, এদ্বিষয়ে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারের প্রতিধ্বনি করে আজকের দিনে বলা চলে যে, শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির প্রথম শর্তগুলোর একটি হচ্ছে কমপক্ষে জি-৭ এর শ্রমিকদের সম্মিলিত ক্রিয়া।

তবে, ভয়ানক স্বার্থান্ধ, মারাত্মক অস্ত্রে -শস্ত্রে সজ্জিত, ভয়ংকরভাবে উন্মত্ত, জঘন্য শ্রেণী ঘৃণা ও শ্রেণী হিংসায় সীমাহীন বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা, নৃশংসতা ও চরম হিংস্রতায় হিংসাচ্ছন্ন এবং ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাকে অবজ্ঞা ও অস্বীকারকারী তাই, মরণকামড় দিয়ে মরিয়া হয়ে টিকে থাকার বাতিকে বাতিকগ্রস্ত শোষক বুর্জোয়া শ্রেণীর উৎখাত পর্ব তথা **কমিউনিস্ট বিপ্লব যে ভয়ানরকমের সংঘাত ও সংঘর্ষময় বৈ শান্তিপূর্ণভাবে হবে না তাও নিশ্চিত**।

উল্লেখ্য, পুঁজিতন্ত্র একটি বৈশ্বিক ব্যবস্থা বলেই একাকী কোনো এক দেশে যেমন পুঁজিতন্ত্রের বিনাশ সম্ভব নয়, তেমন কমিউনিস্ট বিপ্লবের কেন্দ্রবিন্দু জি-৭ হলেও এটির ব্যাপ্তী বা পরিসীমা হচ্ছে বৈশ্বিক। কারণ, পণ্যের বিশ্ব বাজারের নিয়ামক শক্তি জি-৭ এর পতন হলে এর প্রভাব এবং ক্রিয়ায় বাকী দুনিয়ায় পণ্য ও পুঁজি যেমন বিলীন হতে থাকবে তেমন দুনিয়ার শ্রমিকেরা পুঁজিতন্ত্রের কফিনে শেষ প্যারেক বসানোর আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদি তড়িৎ গ্রহণের সুযোগ পাবে। ফলে, পণ্য, পুঁজি ও পুঁজিতন্ত্র দুনিয়া হতে অদৃশ্য হবে।

কমিউনিস্ট বিপ্লব যেহেতু দুই বিপরীত শ্রেণীর স্বার্থের বিরোধের শীর্ষ বিন্দু সেহেতু, কমিউনিস্ট বিপ্লব পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিমালিকানার বিলোপ সাধন করে শ্রম শক্তির বেচা-কেনাতো বটেই সামগ্রীকভাবে বেচা-কেনার অবসান ঘটিয়ে পণ্য ও পুঁজিকে অদৃশ্য করে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণের সমাপ্তি সাধন করে শোষণমূলক ব্যবস্থা তথা ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভুত সকল প্রকার বিধি-বিধান, রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কৃতি, মতাদর্শ, রাজনীতি ও তদ্বিষয়ক সকল প্রকার সংস্থা-সংগঠন সমেত যাবতীয় অস্ত্রাদি তথা পরিবার, রাজনৈতিকদল, রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র রক্ষক আইএমএফ ইত্যকার সকল জঞ্জালকে ইতিহাসের

আস্তাকুঁড়ে ঠাঁই দিয়ে মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসনের বর্বরতার অবসান ঘটিয়ে দুনিয়ার সকল মানুষের সাধারণ মালিকানাধীন উৎপাদনের উপায় ও পরিবহন এবং যোগাযোগের মাধ্যম সমূহের যথাযথ ব্যবহার এবং দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য সর্বাধুনিক সামগ্রী উৎপাদন ও যাবতীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সমন্বয় সাধনের জন্য **প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে দুনিয়ার সকলের জন্য, সকলে কর্তৃক নির্বাচিত এবং সকলের একটি বিশ্ব সমিতি প্রতিষ্ঠার সকল ভিত্তি তথা আবশ্যকীয় শর্তাদির পত্তন করবে কমিউনিস্ট বিপ্লব।**

অতঃপর, কমিউনিস্ট বিপ্লবের কাজ হচ্ছে ব্যক্তিমালিকানা, সমবায়িক মালিকানা, কোম্পানী ও বহুজাতিক কোম্পানীর মালিকানা, এবং রাষ্ট্রিক মালিকানা সমেত পুঁজিতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার স্বার্থে, শর্তে, অনুকুলে বা স্ব-পক্ষে অথবা শোষণমূলক ব্যবস্থার অনুকুলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য - সহযোগিতা করতে কথিত দাতা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানাদি সমেত তদার্থে গঠিত, প্রতিষ্ঠিত, স্থাপিত সকল ধরণের প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সংগঠন, বা শোষণের অনুকুল ব্যবস্থা বজায় রাখতে প্রবর্তিত সকল ধরণের রাজনীতি প্রচার, প্রসার ও ক্রিয়াশীলতার জন্য প্রতিষ্ঠিত সকল প্রতিষ্ঠান,সংস্থা, সংগঠন ও এসবের দপ্তর, বা পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সহনশীল ও বজায় রাখতে রেডক্রস, অক্সফার্ম ইত্যাদি সহ কথিত মানবাধিকার,সকলকে ধনী বানানোর খোয়াব দেখানোর ধান্ধাবাজির বা ভিন দেশের লোকের টাকায় পরিচালিত প্রকল্পের মাধ্যমে স্বদেশী ও স্বনির্ভর সাজার আঞ্জাম করতে প্রাকৃতিক পরিবশে ক্ষুন্নকারী পুঁজিতন্ত্রের সকল সুযোগ-সুবিধাভোগীদের অকৃত্রিম পরিবেশ রক্ষার ভুয়া প্রচেষ্টাকারী ইত্যকার সকল প্রকার এনজিও প্রতিষ্ঠান, সংস্থা এবং সর্বোপরি, জাতিসংঘ, আই এম এফ, বিশ্ব ব্যাংক, আই এল ও ইত্যকার সকল সংস্থা, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় সহায়-সম্পদের বিদ্যমান অন্যায়-অন্যায্য দখলদারীত্বের অবসান ঘটিয়ে এই সব সম্পত্তিতে দুনিয়ার সকল মানুষের সাধারণ মালিকানা তথা সামাজিক মালিকানা অর্থাৎ ন্যায্য ও ন্যায়সংগত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা।

কিন্তু, উল্লেখিত সব ধরণের মালিকানাধীন সম্পত্তি তথা পণ্য উৎপাদন ও বিনিময়ের সকল উপায়াদির বিদ্যমান অন্যায্য মালিকানা সংরক্ষায় **স্বয়ংঘাতি গুপ্তঘাতক** সহ নানান ধরণের নানান তরফের স্বশস্ত্র রক্ষী-পাহারাদাদের এক বিশাল বাহিনী বিদ্যমান ও স্বক্রিয়। তাই, পুঁজিপতি শ্রেণী তাদের অযৌক্তিক, অন্যায্য ও অন্যায় ব্যক্তিগত মালিকানা বহাল ও বজায় রাখতে এই সব স্বসশ্র বাহিনীকে ব্যবহার করবে এটাই স্বাভাবিক। অতঃপর, কমিউনিস্ট বিপ্লব রুখে দিতে, ধ্বংস করতে বিপ্লবী শ্রমিকদের উপর উন্মত্ত-হিংসাশ্রয়ী বুর্জোয়া শ্রেণী

স্বসশ্র হামলা-আক্রমণ চালানো সহ সব ধরণের দুস্কর্মে লিপ্ত হবে। কিন্তু, বর্বরতায় আচ্ছন্ন ও খুনের নেশায় উন্মত্ত ও হিংসাচ্ছন্ন বুর্জোয়ারা চিন্তা করতে অক্ষম যে, যে সব অস্ত্র দিয়ে বিপ্লবী শ্রমিকদেরেকে হত্যা-খুন ও দমন করার অপচেষ্টা করা হবে সেসব সহ সকল ধরণের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধাস্ত্রের বাহনাদি শ্রমিকেরাই উৎপাদন করে এবং বুর্জোয়াদের হামলা আক্রমণ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করে জীবন বাঁচাতে কেবলমাত্র যুদ্ধাস্ত্রাদি ও যুদ্ধাস্ত্রদি পরিহনের যাবতীয় বাহনাদি উৎপাদন বন্ধ করা ছাড়াও বিপ্লবী শ্রমিকেরা এই সব অস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করতে অক্ষম ও অযোগ্য নয়। আর যদি বুর্জোয়ারা লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীদেরকে দমন করার জন্য হামলা-আক্রমণ চালায় তবে তা প্রতিহতকরণ ও আক্রান্তদের জীবন রক্ষায় এবং জয়লাভে তথা মুক্তিলাভে মুক্তি প্রত্যাশী শ্রমিক শ্রেণী স্বশস্ত্র হলে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব ও দায়ভাগ বর্তায় কিন্তু আক্রমণকারী বুর্জোয়া শ্রেণীর উপর।

শোষণ-শাসন মুক্ত হয়ে দুনিয়ার সকলের জন্য একটি স্বাধীন ও মুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় বুর্জোয়াদের আইনে বৈধ হলেও কার্যত, ন্যায়ত ও যুক্তিসংগভাবে এবং প্রকৃতই অন্যায়-অন্যায্য ও অযৌক্তিক ব্যক্তিমালিকানার বিলোপনে শ্রমিকেরা যারা যেখানে বা যে কারখানায় বা যে প্রতিষ্ঠানে শ্রম শক্তি বিক্রি করে শোষিত হয় তারা সেখানকার বা সেসব কারখানা বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার সম্পত্তির দখল নিতে চেষ্টা করবে প্রাথমিকভাবে এটাই স্বাভাবিক, তবে বিচ্ছিন্নভাবে নয়। কিন্তু, অন্যায্য ও অন্যায় দখলদার বুর্জোয়াদের ততধিক অন্যায্য ও অন্যায় হামলা-আক্রমণের শিকার হলে প্রতিরোধে ও বিজয় অর্জনে রাস্তায় নামা, কাজ বন্ধ করা সহ খুবই যুক্তিসংগত ও ন্যায় সংগতভাবে স্বশস্ত্র হতে বাধ্য হবে বটে পরাজয়ে সুযোগহীন ও পরাভবে অক্ষম বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী, অর্থাৎ সকল দুস্কর্মের হোতা বুর্জোয়া শ্রেণীই স্বীয় দুস্কর্মের দ্বারা বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীকে স্বসশ্র করবে। ফলে- স্বীয় শ্রেণীর মুক্তির স্বার্থে ন্যায় সংগত ও যুক্তিসংগত মালিকানা অর্জনের মাধ্যমে কার্যত সমগ্র মানবজাতির মুক্তি হাসিলে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মধ্যেকার স্বসশ্র হতে সক্ষম ও ইচ্ছুক এমন সকল ব্যক্তির সমন্বয়ে এক স্বশস্ত্র বিপ্লবী শক্তির জন্ম দিবে স্বসশ্র প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী। কোনো সন্দেহ নাই, শ্রমিক শ্রেণী ছাড়াও অশ্রমিক বিশেষত ছাত্র-যুবা এবং বুর্জোয়াদের একটি অংশ কমিউনিস্ট বিপ্লবে যেমন অংশ নিবে এবং কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে তেমন শ্রমিকদের মধ্যকার সুবিধাভোগী বা চিন্তার জগতে পুঁজিতন্ত্রী বা পুঁজিতন্ত্রী রাজনীতিক বা প্রথাগত ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবসাদার বা ইতোমধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হয়েছে বা বিভ্রান্ত কিছু কিছু ব্যক্তি কমিউনিস্ট বিপ্লবে অংশ নিবে না বরং এদের কেউ কেউ বিপ্লব বিরোধী দুস্কর্মে লিপ্ত হবে।

অতঃপর,কমিউনিস্ট বিপ্লবের শীর্ষ বিন্দুটা জি-৭ হলেও সমগ্র দুনিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয় সুনিশ্চিত করা তথা ব্যক্তিগত বা সমবায় বা বহুজাতিক বা রাষ্টিয় মালিকানাধীন বা তদার্থের দুনিয়ার সর্বশেষ সম্পত্তিটির প্রথাগত মালিকানা তথা ব্যক্তিগত মালিকানার স্বপক্ষীয় দুনিয়ার সর্বশেষ সম্পত্তিটির মালিকানা বিলোপের মাধ্যমে দুনিয়ার সকল মানুষের মালিকানা তথা সামাজিক মালিকানায় রূপান্তর যে একদিনে হবে না তাও নিশ্চিত। অতঃপর, কমিউনিস্ট বিপ্লব কেবল কতিপয় ব্যক্তি বা কোনো বিশেষ চক্রভুক্ত ব্যক্তিদের বা কারো কারো ১ দিন বা ১ মাসের কাজও নয় বরং দুনিয়ার কোটি কোটি শ্রমিকের তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বেশ কিছু মাস বা বছরের তবে ইতিহাসে সেরা এক বিশাল কর্মযজ্ঞ বটে। সুতরাং, **কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে মানবজাতির ইতিহাসে সবচাইতে বড় এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।**

উল্লেখ্য, কমিউনিস্ট বিপ্লব কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট হয়ে উঠার এক বিশাল কারখানাও বটে। কারণ, কমিউনিস্ট বিপ্লবকালীন অবস্থায় কেবলমাত্র বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী বিপ্লবীরাই কমিউনিস্ট বিপ্লবের জয় নিয়ে চিন্তা করবে, প্রাসংগিক ও সম্পৃক্ত বিষয়ে পারস্পারিক আলোচনা করবে এমনটা নয়, বরং বিপ্লব বিরোধীরাও বিপ্লবের চাপে -ভারে থাকবে বলেই তারাও অর্থাৎ উভয় পক্ষই কমিউনিস্ট বিপ্লবের নৈমিত্তিক কার্যাদি, ঘটনা প্রবাহ, বিপ্লবের কার্যকারণ, দায়-দোষী, বিপ্লবের পরিণতি বা কমিউনিস্ট বিপ্লবের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা, এই বিপ্লবের ঐতিহাসিক কারণ, অতীতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজগুলির পরিবর্তনের ইতিহাস ইত্যকার যাবতীয় বিষয়ে চিন্তা করবে, আলোচনা করবে, এবং সকল আলোচনা যথার্থ ও সঠিকভাবে করা তথা বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করার জন্য বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বিষয়ে দ্রুত হতে দ্রুততর সময়ে আবশ্যকীয় তত্ত্ব-তথ্যাদি পাবে; প্রকৃতি ও সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক তথা মানুষে মানুষে সম্পর্কের বিষয়াদি খোলাখুলিভাবে জানা-বুঝার অবারিত সুযোগ পাবে, আবার অতিতের বিষয়ে চিন্তার জন্য আবশ্যকীয় বিষয়াদির অনুসন্ধান করবে, প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে, পর্যালোচনা ও পুনঃপুন পর্যোলোচনা করবে; এবং এসবের পরম্পরায় অনুমিত সিদ্ধান্তে ও সিদ্ধান্তে পোঁছাবে। আর যতই প্রকৃতি ও মানব জাতি এবং মানুষের সমাজ সম্পর্কে ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভূত সকল অসত্য-ভুয়া ও মিথ্যা বিষয়াদি তথা সামগ্রীকভাবে রাজনীতি ও মতাদর্শ বা মাইথলোজী ইত্যকার বিষয়ের কেবল মিথ্যাচারিতা-দ্বিচারিতাই নয় বরং সংখ্যাগরিষ্ট মানুষজনদের জন্য এই সবই যে ক্ষতিকর উপরন্ত এসবই জগত-জীবন সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা ও অন্ধত্বের ভান্ডার তা জানতে-বুঝতে সক্ষম হতে থাকবে ততই

ব্যক্তিমালিকানা হতে উদ্ভূত সকল চিন্তা-ভাবনা, রীতি-নীতি ও সংস্কৃতি পরিত্যাগ করতে থাকবে। কোনো সন্দেহ নাই, কমিউনিস্ট বিপ্লবকালে বিজ্ঞান সহ এসব বিষয়ে বিপুল সাহিত্য রচিত হবে। এই সাহিত্যের প্রভাব ইতিবাচকভাবে ক্রিয়াশীল থাকবে।

অতঃপর,কমিউনিস্ট বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী যে সব ব্যক্তিরা কমিউনিস্ট না হয়েও পরিস্থিতিজনিত কারণে কমিউনিস্ট বিপ্লবে অংশ নিয়েছে তারা সহজেই কমিউনিস্ট হয়ে উঠা সহ নিয়তই নিজের অতীতের অন্ধত্ব ও অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার বিরুদ্ধে নিজেই নিত্য লড়াই করবে আর এই লড়াইয়ে উত্তীর্ণ হতে থাকবে আর যারা কমিউনিস্ট বিপ্লবের এলাকায় থাকবে এবং যতই দিন যাবে ততই কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মুক্ত এলাকার আয়তনের বৃদ্ধি হবে বলে কমিউনিস্ট বিপ্লব বিরোধীদের পরাজয় ও বিপ্লবের জয় দৃশ্যমান দেখে-বুঝে এবং সর্বোপরি, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের দখলাধীন এলাকা তথা মুক্ত অঞ্চলের প্রায় মুক্ত ও স্বাধীন মানুষদের উন্নততর সামাজিক আচার-আচরণ; উৎপাদন ও বিনিময়ের হাতিয়ারদির ব্যক্তি মালিকানা মুক্ত অবস্থার এসব হাতিয়ারকে ব্যবহার তথা বেচা-কেনা মুক্ত এবং শোষণমুক্ত উৎপাদনী কার্যক্রম; এবং সকলের জন্য আবশ্যকীয় দৈনন্দিন সামগ্রী প্রাপ্তির সামাজিক ব্যবস্থাপনার উন্নততর ব্যবস্থায় মুক্ত এলাকার সকলের উন্নততর মানবিক জীবনমানের প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান বিষয়াদি দেখে-শুনে ও অতীতের সাথে তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করে অকমিউনিস্টদের মধ্যকার কম-বেশ সকলেই কমিউনিস্ট হয়ে উঠার সর্বাধিক অনুকুল সুযোগ-সুবিধা পাবে,কমিউনিস্ট হতে উৎসাহ-প্রেরণা বোধ করবে এবং কমিউনিস্ট হতে থাকবে।

উল্লেখ্য, মস্তিষ্ক চিন্তার অংগ হলেও চিন্তার উৎস নয়, বরং প্রত্যেকের চিন্তাই প্রভাবিত ও নির্ধারিত হয় প্রত্যেকের সামাজিক অবস্থান দ্বারা। তাই, একই ধরণের সামাজিক অবস্থার মধ্যে থাকা সকলেই কম-বেশ একই রকমের চিন্তা বা একই বিষয়ের চিন্তা করাই স্বাভাবিক। তাই, চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা তক কমিউনিস্ট বিপ্লব এক বিশাল সংখ্যক কমিউনিস্ট তথা বিজ্ঞানী যারা সকল মানুষই সমান -এই নীতির কেবল স্বীকৃতকারীই নয় বরং এই নীতি অনুশীলকারী মানুষের জন্ম দিবে। ফলে, এই সকল কমিউনিস্টরা অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা অতীতের সকল ধরণের বৈষম্য-বৈরীতার সকল মূল্যবোধ-নৈতিকতা, রীতি-নীতি, প্রথা-সংস্কৃতি ইত্যকার সকল আবর্জনামুক্ত মানবিকবোধ সম্পন্ন মানুষ হবে বলেই কমিউনিস্ট বিপ্লব অতীতের সকল মতাদর্শ, ভাবধারা, সংস্কৃতি ইত্যাদির সাথে আমূল বিচ্ছেদ ঘটাবে। সুতরাং,

সমাজতন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞানীদের সমাজ, সমান মানুষদের এক মানবিক সমাজ এবং এক নতুন সমাজ।

কিন্তু, কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রথম ধাক্কায় অর্জিত সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারের সকল অধিকার সমেত বর্ণিত সব ধরণের স্বত্ব বা মালিকানার জন্য বিদ্যমান সকল আইন-কানুন বা তদসংশ্লিস্ট বা তদ উদ্ভূত বা তদার্থে প্রণীত ও কার্যকৃত দন্ড বিধি সমেত সকল আইন-বিধান রদ-রহিত ও বাতিলকরণের মাধ্যমে উল্লেখিত সব ধরণের মালিকানা বাতিল করে দুনিয়ার সকল মানুষের সাধারণ সম্পত্তি গণ্যে ও চিহ্নিত করে দুনিয়ার সকলের পক্ষ হতে সেসব সম্পত্তির সাধারণ মালিকানা গ্রহণ ও হেফাজতে উপযুক্ত ব্যবস্থা; উল্লেখিত সাধারণ সম্পত্তির যথার্থ ও উপযুক্ত ব্যবহার করে পরজীবীতার সুযোগ হারানো সকলের সহ সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির উৎপাদনী ও সামাজিক ক্রিয়াদিতে সম্পৃক্তকরণ; মুক্ত এলাকার সকলের জন্য আবশ্যকীয় সামগ্রী উৎপাদন ও সকলের ভোগ-ব্যবহারের নিমিত্তে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার কার্যকর পরিবহন ব্যবস্থা ও যোগাযোগ নিশ্চিতকরণ; ইনফরমেশন সিস্টেম সহ সমাজরূপান্তর প্রক্রিয়ায় আধুনিকতম পরিবহন, যোগাযোগ ও অত্যাধুনিক চিকিৎসা সমেত অত্যাধুনিক শিল্প প্রকল্প এবং আরো আরো যে সব প্রকল্প ও পরিকল্পনা আবশ্যক তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; এবং বিপ্লবের চূড়ান্ত বিজয় নিশ্চিতকরণে অবশিষ্ট দুনিয়া বিজয়ে সেখানকার বিপ্লবীদের সকল ধরণের কাজের সহিত সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে একটি কর্তৃত্ব তথা বিপ্লবী পরিষদ যা মূলত কিছুটা মাত্রায় রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পন্নও তা প্রতিষ্ঠা করবে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী তথা কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা। কমিউনিস্ট বিপ্লব পরিপূর্ণ বিজয় লাভ করা পর্যন্ত এরূপ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিপ্লবী পরিষদের আবশ্যকতা ও উপযোগিতা থাকবে।

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের স্বসশ্র শক্তি এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবী পরিষদ কারো উপর শোষণ-পীড়ন করার জন্য নয় বা শ্রমিক শ্রেণীর জন্য বিশেষ কোনো সুবিধা হাসিলের জন্য নয় বা কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের জন্য কোনো বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা করার জন্য নয় বরং অতীতের সকল শোষক শ্রেণীর সকল অসভ্য-বর্বর ও হীন কার্যাদির সমাপ্তিতে থাকবে সক্রিয়। তবে, বুর্জোয়াদের হামলা-আক্রমণ প্রতিহতকরণ, তাদের অন্তর্ঘাত মূলক তৎপরতা রোধ বা প্রতিরোধ এবং চূড়ান্তভাবে সকল ধরণের পরজীবী সমেত সামগ্রীকভাবে বুর্জোয়াতন্ত্র ও সমগ্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে পরাস্ত ও পরাজিত এবং বিলীন ও বিলুপ্ত করে কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিজয় নিশ্চিতকরণার্থে আবশ্যকীয়

কার্যাদি সম্পাদন করাই হবে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের স্বসশ্র শক্তি ও কমিউনিস্ট বিপ্লবী পরিষদের কাজ।

তবে, স্থায়ী আমলাতন্ত্র বা স্থায়ী বিচার বিভাগ বা আইন পরিষদ নামীয় কোনো পরিষদ থাকার সুযোগ নাই কমিউনিস্ট বিপ্লবী পরিষদের। মূলত, সম্পত্তির সত্ত্ব গ্রহণ, সেসব ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, সামাজিক তহবিল গঠন ও পরিচালনা সহ আরো আরো যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে মতামত গ্রহণ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বা সম্পত্তির স্বত্ত্ব বিষয়ে ঘোষণা সমেত উপরোল্লেখিত বিষয়াদি সমেত আরো আরো যে সকল বিষয়ে মতামত ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে অনুরূপ সকল বিষয়ে বা তদসংক্রান্ত বিষয়ে সুপারিশ, দৃষ্টিভংগি, প্রস্তাব, ঘোষণা বা ইত্যকার বিষয়াদিতে সংশ্লিষ্টদের মতামত গ্রহণ ও গৃহীত সব সিদ্ধান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পৃক্তকরণে ও অবহিতকরণে আবশ্যকীয় অবহিতকরণপত্র ইস্যু, প্রকাশ ও প্রচার করার বিহীতাদি সাধন করবে কমিউনিস্ট বিপ্লবী পরিষদ এবং সামরিক বিষয়ে প্রধানত কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের বিপ্লবী স্বসশ্র শক্তি।

উল্লেখ্য, শোষকদের প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নয়, বরং শোষণ হতে মুক্তির ক্রান্তিকালের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্বপূর্ণ কমিউনিস্ট বিপ্লবী পরিষদ হবে মানবজাতির মধ্যকার সকল রাজনীতি বিলীনের বিহীত সাধনকারী রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। তবে, এটিও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বটে কারণ এই পরিষদও বুর্জোয়া শ্রেণীকে কেবল প্রতিরোধ করাই নয় বরং সমূলে উচ্ছেদ ও নিমূলীকরণে একটি সংগঠিত শক্তি তাই এটি একটি রাজনৈতিক শক্তি।

সন্দেহ নাই, বুর্জোয়া শ্রেণীও অসংখ্য রাজনৈতিক দল সমেত রাজনীতির সুবিধাভোগী একটি শ্রেণী। তাছাড়া, রাজনৈতিক ক্ষমতা বলেই বুর্জোয়া শ্রেণী বুর্জোয়া সম্পত্তিকে বৈধ বলে গণ্য করেছে ও দখলে রাখছে।তাই, বুর্জোয়া শ্রেণীকে তাদের কথিত "বৈধ" সম্পত্তি হতে উচ্ছেদ করে শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়া শ্রেণীকে বিলীন ও বিলুপ্ত করতে এবং বুর্জোয়াদের দখলমুক্ত সম্পত্তিকে দুনিয়ার সকলের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য-বিবেচিত ও সাবস্ত করে সেসব সম্পত্তির অছিদার বা ট্রাস্টিরূপে ক্রিয়াশীল কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পরিষদ গুরুত্বহীন অর্থে হলেও বা কিঞ্চিত মাত্রায় হলেও একটি রাজনৈতিক শক্তি। তবে, কমিউনিস্ট বিপ্লবোত্তর কালে যেহেতু মানব জাতির মধ্যে কোনো শ্রেণী নাই, জাতি নাই, বৈষম্য নাই, ভাগ-বিভাগ নাই, সেহেতু সমাজতন্ত্রে উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের সকল উপায়াদির মালিক বটে অখন্ড মানব জাতি। তবে,সমাজতন্ত্রে সকল মানুষের জন্য আবশ্যকীয় সকল সমগ্রী উৎপাদন ও

ব্যবহারে আবশ্যকীয় পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের জন্য ক্রিয়াশীল থাকবে **একটি বিশ্ব সমিতি**।

অতঃপর, সম্পত্তির কোনো অছিদার বা ট্রাস্টি আবশ্যক নয় বিধায় রাজনীতিও অনাবশ্যক, রাষ্ট্রতোই নয়ই, এমনকি শ্রেণী শোষণ ও শ্রেণী শাসনের কোনো ধরণের হাতিয়ার কমিউনিস্ট সমাজে থাকার সুযোগ নাই। তাই, কমিউনিস্ট বিপ্লবের কাল হচ্ছে কেবল রাষ্ট্র নয়, বরং রাষ্ট্র রক্ষক বৈশ্বিক সংগঠনাদি ও রাজনীতি সমেত সকল ধরণের শ্রেণী হাতিয়ারের বিলুপ্তি ও সমাপ্তিকাল। সুতরাং, **সমাজতন্ত্র হচ্ছে রাজনীতি মুক্ত, রাষ্ট্রহীন ও শ্রেণীহীন এক সমাজ।**

মূলত, কমিউনিস্ট বিপ্লব হচ্ছে পুঁজিতন্ত্রী সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরের কাল তথা একটি পুরনো সমাজ হতে আরেকটি নতুন সমাজে উত্তীর্ণ হওয়ার কাল। তাই, এটি পরিবর্তনকালীন কাল বা ক্রান্তি কাল। এই ক্রান্তিকালের রাজনৈতিক, সামরিক, সামাজিক এবং উৎপাদনী, পরিবহন ও যোগাযোগের কার্যাদি সমন্বয়ের কাজ করবে বটে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পরিষদ ও স্বসশ্র শক্তি। কাজেই, কমিউনিস্ট বিপ্লবে অংশ গ্রহণকারী সকলেই সাধারণভাবে এই দুই শক্তির সকল নীতিগত ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যকরণে সমান অংশীদার তবে দায়-দায়িত্বে রদ-বদল বা পরিবর্তন হবে এটাই স্বাভাবিক। দুই সংগঠনেরই বৈশ্বিক, এরিয়া বা স্থানীয় কাঠামো বা নানান সেক্টর ভিত্তিক কাঠামো বা শাখা পরিষদের যে কোনো পদ-পদবী গ্রহণে প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে সংশ্লিষ্ট সকলেই যোগ্য ও উপযুক্ত বলে বিবেচিত হওয়াটাই যুক্তি সংগত।সংগঠনের কোনো স্তরে কোনো মূল বা প্রধান সমন্বয়কারী নয়, বরং প্রত্যেক স্তরের সমন্বয় পরিষদ গঠিত হবে একজন সমন্বয়ক সহ কয়েকজন বা আবশ্যকীয় সহ সমন্বয়কারী ও সদস্য সমন্বয়ে সংশ্লিষ্টদের ভোটে, সিদ্ধান্ত হবে সাধারণভাবে সংশ্লিষ্টদের সংখ্যাগরিষ্ট মতে। অতঃপর, **সকলেই সমান**- এই নীতি তথা কমিউনিস্ট নীতিতে উভয় সংগঠন পরিচালিত হবে। কমিউনিস্ট বিপ্লবের বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো দুস্কর্ম সংঘটিত না করলে বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে কোনো ধরণের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় লিপ্ত না থাকলে পরাজিত যেকোনো বুর্জোয়াকেও কতিপয় বিষয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতেই পারে।

উল্লেখ্য, সংগঠন দুটির পদাধিকারী কারো কারো বা কখনো কখনো বিশেষ বিশেষ কাজের কারণে সামাজিক উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের নিজ নিজ নৈমত্তিক কাজে কখনো কখনো বিরত থাকার আবশ্যকতা দেখা দিলে তারা হয়তো নিজ নিজ কাজ হতে বিরত থাকবে কিন্তু সাধারণভাবে সকল

সক্ষম ব্যক্তিকেই তাদের প্রত্যেকের নৈমত্তিক কাজে নিয়মিত অংশ নেওয়াটাই হবে স্বাভাবিক ।

কিন্তু, কমিউনিস্ট বিপ্লব বিজয়ী হলে এই উভয় সংগঠনের যেমন উপযোগীতা থাকবে না তেমন সমাজতন্ত্রে বিলুপ্ত হবে খোদ শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিটিও, যেটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের জন্য দুনিয়ার শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করার জন্য গঠিত হবে। আসলে, মজুর বা শ্রমিক বলে কেউ থাকছে না কমিউনিস্ট বিপ্লবোত্তর সমাজে বরং সকলেই মানুষ। তাই, মজুরদের স্বার্থ রক্ষার কোনো হাতিয়ার তথা শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিরও কোনো উপযোগীতা সমাজতন্ত্রে নাই বলেই আর আর সব শ্রেণী হাতিয়ারের মত শ্রমিক শ্রেণীর হাতিয়ার- শ্রমিক শ্রেণীর পার্টিও বিলুপ্ত হবে। ফলে, সমাজতন্ত্রে মানুষ কর্তৃক মানুষকে দমন-পীড়ন বা অধীনস্তকরণ বা অধীনতা তথা মানুষ কর্তৃক মানুষকে শাসন করার এবং অনুরূপ দমন-পীড়ন বা অধীনস্তকরণের কোনো হাতিয়ার থাকছে না। তাই, মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ-শাসন হতে মুক্তকরণের কোনো ধরণের হাতিয়ারও থাকছে না বলে সমাজতন্ত্রে প্রত্যেকেই মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ। অতঃপর, সমাজতন্ত্রেই প্রত্যেক মানুষ হয়ে উঠবে সকল ধরণের বন্যতা-বর্বরতা, হিংস্রতা ও পাশবিকতা এবং প্রভুত্ব ও দাসোচিত মানসিকতা হতে মুক্ত মানুষ। তাই, সকলেই স্বাধীন ও মুক্ত তথা পরিপূর্ণ মানবিকবোধসম্পন্ন মানুষ। **সুতরাং, সমাজতন্ত্রেই প্রকৃত অর্থে এই প্রথম মানুষ হয়ে উঠবে মানুষ।**

তবে, কমিউনিস্ট সমাজের সকল সামাজিক কাজ সমন্বয় বিধান কল্পে দুনিয়ার সকলের একটি বিশ্ব সমিতি গড়ে উঠবে কার্যত কমিউনিস্ট বিপ্লব চলা কালে গড়ে উঠা ভিত্তি ও শর্তে। অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের স্বসশ্র শক্তি ও কমিউনিস্ট বিপ্লবী পরিষদ বিলীন ও বিলুপ্ত হবে আর তদস্থলে সমাজের সকল সামাজিক কাজ সমন্বয় সাধনে সকলের জন্য , সকলের দ্বারা নির্বাচিত ব্যক্তির সমন্বয়ে তবে প্রত্যাহার যোগ্যতার শর্তে যে কোনো পদ-পদবীতে যে কারো নির্বাচনের উপযুক্ততার শর্তে তবে সকলেই যে কোনো পদ বা পরিষদে স্বল্পকালীন মেয়াদে কাজ করার জন্য দুনিয়ার সকলের একটি বিশ্ব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজতন্ত্রে। তাই, সমাজতন্ত্রে রাষ্ট্র নাই, রাজনীতি নাই, শাসন নাই, অপরাধ ও দন্ড নাই, দমন-পীড়ন নাই, অন্যায় ও অন্যায্যতা নাই, হিংসা ও যুদ্ধ নাই, অশান্তি নাই, অতঃপর, কোনো প্রকার অসাম্য-বৈষম্য সমাজতন্ত্রে নাই। সুতরাং, **সমাজতন্ত্র হচ্ছে বৈষম্যমুক্ত একটি সমাজ, সমান ব্যক্তিদের একটি সমাজ এবং নিরন্তর শান্তির একটি সমাজ, তাই মানবিকতায় ভরপুর, চিরশান্তির অহিংস মানুষদের ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সমাজ।**

উল্লেখ্য, বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজি উৎপন্ন ও পুঁজির অস্তিত্বের শর্তে বিজ্ঞানের সূচনা করলেও বা উৎপাদনের যন্ত্র সমূহের অবিরাম বৈপ্লবীকরণ করলেও পুঁজির স্বার্থ বৈ বিজ্ঞানের অবাধ চর্চায় পুঁজি বিনিয়োজিত করে না বা বিজ্ঞানের অবাধ চর্চা করে সার্বজনীন কল্যাণ সাধনের মতো উদার হওয়ার সুযোগ নাই পুঁজির শৃংখলে বন্দী ও সংকীর্ণ শ্রেণী স্বার্থে অন্ধ বুর্জোয়া শ্রেণীর। তাই, যতই সার্বজনীন কল্যাণ হোক না কেন কিন্তু সাধারণভাবে, যদি কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় বিনিয়োজিত পুঁজি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নতুন পুঁজি সমেত ফিরে আসার মতো না হয় তবে সেক্ষেত্রেও বুর্জোয়ারা পুঁজি বিনিয়োগ করে না পুঁজিরই অস্তিত্বের শর্তে বিধায় বিজ্ঞানের সুবিধাভোগী হওয়া সত্ত্বেও বুর্জোয়ারা বিজ্ঞানের অবাধ অগ্রগতিকে ব্যাহত ও বিঘ্নিত করছে।

উপরন্ত, স্বার্থান্ধতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত বুর্জোয়ারা ইতিহাসের গতি-প্রকৃতিকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করে চিরকাল বুর্জোয়াশ্রেণী হিসাবে টিকে থাকার জন্য প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া শ্রেণী বিজ্ঞান বিরোধী নানান রাজনীতির নিকট আশ্রিত হয়ে ঐ সব বিজ্ঞান বিরোধী নানান রাজনীতির মোড়কে বিজ্ঞান বিরোধী প্রপাগান্ডা চালানো সহ নানান ক্রিয়া-কর্ম দ্বারা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গতিকেও দারুণভাবে রুদ্ধ-ব্যাহত করছে।

একথা সত্যি যে, নিষিদ্ধ কোনো সেক্টরে বিনিয়োগ ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ হলেও যদি মুনাফার হার অধিকমাত্রায় পাওয়ার সুযোগ দেখে তা হলে ঐসব ঝুঁকিপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ করে দেউলিয়া হওয়া সমেত পুঁজির মালিককে ফাঁসিতে ঝুলাতেও দ্বিধা করে না ক্ষমতাধর পুঁজি। তাই, নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ভয়ানক ঝুঁকি থাকলেও যদি রিটার্ণের হার বেশী বলে মনে হয় সেসব ক্ষেত্রে লোভী পুঁজিপতি বিনিয়োগে ঝুঁকি নেয় না এমনটা নয়। তবে, গবেষণায় কাংখিত ফল লাভ না হলেও বা বিনিয়োজিত পুঁজি অধিকহারে ফিরে আসা নয়, বরং প্রায় সবটাই হারিয়ে গেলে এমন ব্যর্থতার রেকর্ডকে ভিত্তি গণ্যে এরকম ঝুঁকিপূর্ণ খাতে পুঁজি বিনিয়োজিত হয় না বলেই বিজ্ঞানের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হচ্ছে বলেই এখনো মানবজাতি পরিপূর্ণভাবে জানে না এমনকি কেবল ইউনিভার্স নয় বরং পৃথিবীর অভ্যান্তরীণ বিষয়াদি সমেত ভূমিকম্পের কারণ অথবা জানে না সমুদ্রে অবস্থিত মোট প্রাণীদের মোট প্রকারভেদ বা মানব স্বাস্থ্যের জন্য দরকারী হলেও ডায়াবেটিস সহ নানান এমনকি স্বেতীর মতো সাধারণ রোগ-ব্যাধি নির্মূলীকরণের চিকিৎসা।

কিন্তু, একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সমাজ, পুঁজি ও পুঁজিপতিশ্রেণী মুক্ত তথা শ্রেণীহীন সমাজ বলেই বিজ্ঞানের গতি রুদ্ধ -ব্যাহত করার কোন অপশক্তি সমাজতন্ত্রে নাই। তাই, প্রকৃতির কোড এবং যেকোন

জিনিষের সৃষ্টি ও পরিবর্তনের কোড তথা সূত্র অর্থাৎ বিজ্ঞান জেনে, বুঝে, গ্রাহ্য ও অনুশীলণ করে সমাজের সকলের বৈজ্ঞানিক হওয়ার পথও যেমন অবারিত ও মুক্ত হবে সমাজতন্ত্রে তেমন বিজ্ঞান এগিয়ে যাবে অবাধ গতিতে এমনকি অবাধ গতির ফলাফলে বহুমুখিনতার গতির নানান গতি তথা অচিন্তনীয় গতি লাভ করবে বিজ্ঞান। তাই, এক মৃত্যুঞ্জয়ী মানব জাতি লাভ করা সমেত প্রকৃতিকে বিজয় করতে ক্রমাগত এগিয়ে যাবে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের অবাধ বিকাশের সমাজ–সমাজতন্ত্র। তাই, সমাজতন্ত্রে সকলেই বিজ্ঞানী। সুতরাং, **সমাজতন্ত্র হচ্ছে বিজ্ঞানীদের একটি সমাজ**।

উল্লেখ্য, অযৌক্তিক, অন্যায্য ও অন্যায় ব্যক্তিমালিকানার পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ বলেই শ্রেণী বিভক্ত পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ হচ্ছে একটি অবৈজ্ঞানিক সমাজ। তাই, অতিতের শ্রেণী বিভক্ত সমাজগুলোর পরিবর্তনের নিয়মেই তথা পুঁজিতন্ত্রী ব্যক্তি মালিকানার বিরুদ্ধে পুঁজিতন্ত্রী শ্রেণীর উৎপন্ন উৎপাদনের হাতিয়াদির বিরোধ,বৈরীতা ও পুনঃপুন বিদ্রোহের পরিণতি তথা পুঁজিপতি শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামের শীর্ষ বিন্দু তথা একটি কমিউনিস্ট বিপ্লবের মাধ্যমে অবৈজ্ঞানিক পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের বিনাশের মাধ্যমে উৎপাদন, পরিবহন ও যোগাযোগের সকল উপায়ের সামাজিক মালিকানা তথা এসবে দুনিয়ার সকল মানুষের ন্যায়সংগত, ন্যায্য ও যৌক্তিক সাধারণ মালিকানার বৈজ্ঞানিক সমাজ– সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায় ও সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকছে না, বরং এটি একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা। সুতরাং, **সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটি বৈজ্ঞানিক সমাজ** ।

অতঃপর, প্রকৃতি বিজয়ে ক্রিয়াশীল সমাজতান্ত্রিক সমাজ কাজ করবে বার্ধক্যমুক্ত চির সবুজ, এবং নিরন্তর শান্তিতে বসবাসকারী মৃত্যুঞ্জয়ী এক সুখি মানব জাতির অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে। এমনকি, প্রাকৃতিক নিয়মেই পৃথিবীর বিনাশ হলেও মানবজাতি যেন তার অস্তিত্ব রক্ষায় সক্ষম হয়, তাও নিশ্চিতকরণে কাজ করবে বটে সমাজতন্ত্র।

অতঃপর, খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন; স্বাস্থ্য সম্মত অত্যাধুনিক পোষক–পরিচ্ছদের বিহীতকরণ; মিল্কিওয়ে, সূর্য, পৃথিবী, চন্দ্র ইত্যকার অবৈজ্ঞানিক নামের সকল কিছুর বিজ্ঞানসম্মত নামাকরণ সমেত বৈজ্ঞানিক কালপঞ্জির প্রবর্তন; সকলের জন্য সহজ–সরল ও মানবিকবোধ সম্পন্ন একটি একক ভাষার প্রচলনে ভাষা ও ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক সংস্করণ; সকল শিশুর সুষম পরিচর্যা ও সুস্বাস্থ্য সমেত বেড়ে উঠা নিশ্চিতকরণ; প্রথাগত শিক্ষা ব্যবস্থার স্থলে পরিপূর্ণ মানবিক বোধে পরিপূর্ণ সাহিত্য সমেত প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষের সমাজ বিষয়ক কোড তথা বিজ্ঞান বিষয়ে শিশু সহ সকলেই আবশ্যকীয় তত্ত্ব এবং

তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে একটি সর্বাধুনিক তথ্য ব্যবস্থার প্রবর্তন; প্রত্যেক শিশুর আনন্দময় শিশু জীবন নিশ্চিতকরণ এবং সুঠাম, সুস্থ শরীর গঠন ও দৈহিক কাঠামোর পরিপূর্ণ বিকাশের পূর্বে কেবলমাত্র শরীর বিকাশ ও মানবিক বোধ বিষয়ক বিষয়াদি ব্যতিত কোনো শিশু বা কিশোরকে তথ্য ব্যবস্থার নিয়মিত কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত না করা; শ্রম আধিক্যের ও অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষেত্রবিশেষ ক্ষতিকর কৃষি ব্যবস্থার বিলুপ্তি; স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর ও ঝুঁকিপূর্ণ সকল কাজে ১০০% যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ; গতি বৃদ্ধি সহ দুর্ঘটনার ঝুঁকি মুক্তকরণে আধুনিক যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার সর্বাধুনিকীকরণ; পাহাড়, বন বা জংগল এবং প্রাকৃতিভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের বসতি পরিত্যাগ করে সকলের নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা বিধানে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ স্থানে সর্বাধুনিক বাসস্থান সমেত মানুষের বসতির পুনঃবিন্যাসকরণ সহ আবশ্যকীয় যাবতীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করাই হবে সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রাথমিক ও আবশ্যকীয় জরুরী কাজ। তাই, অত্যাধুনিক উন্নত ব্যবস্থার সমাজতন্ত্রে ভোগ-ব্যবহার বা আনন্দ- বিনোদন এবং খেলা-ধূলা বা শরীর চর্চা অথবা, ভালোবাসা ও মিলন হবে বটে অবাধ।

উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিমালিকানা মুক্ত সমাজ বলেই বৈধ উত্তরাধিকারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার আবশ্যকতা নাই বলে বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠনের আবশ্যকতা বা পারিবারিক ব্যবস্থার উপযোগিতা সমাজতন্ত্রে নাই। তাই, বৈধ উত্তরাধিকারের নিমিত্তে সৃষ্ট নারীর সতিত্ব -কুমারিত্ব ইত্যকার নোংরামি ও অমর্যাদার বোধবিশেষ সমাজতান্ত্রিক সমাজে অবশিষ্ট থাকার সুযোগ যেমন নাই, তেমন পরিবার নয়, বরং ব্যক্তিই হচ্ছে সমাজের বেসিক ইউনিট। তাই, সমাজতন্ত্রে কেউ নয় উত্তরাধিকার উৎপাদনের যন্ত্র আর স্বামী নামীয় কেউ নয় স্ত্রী জাতীয় কোনো যৌন সামগ্রী বা সম্পত্তির মালিক। সুতরাং, নারী-পুরুষ পরিচয়ে কেউ কারো সম্ভোগকারী যেমন নয় তেমন কেউ কারো সম্পত্তি বা সম্পত্তিতুল্য নয়, বা কেউ নয় রমনী বা কামিনী বা বেশ্যা বা বারো বধু বরং সমাজতন্ত্রে সকলেই মানুষ, মানুষ এবং মানুষ। অতঃপর, সকলেই মানুষ বলেই প্রত্যেকের বন্ধুত্ব, প্রেম-ভালোবাসাপূর্ণ জীবনের জন্য প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব হবে প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের জন্য। **সুতরাং, সমাজতন্ত্র হচ্ছে প্রেম-ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সমাজ।**

অতঃপর, সেক্সিজম বা নারী-পুরুষের ভেদা-ভেদ মুক্ত তথা সকল ধরণের অসাম্য ও বৈষম্যমুক্ত এক অখন্ড মানব জাতির স্বাধীন ও মুক্ত সদস্য হিসাবে প্রত্যেক ব্যক্তি বন্ধুত্ব-ভালোবাসায় যেমন মুক্ত ও স্বাধীন তেমন স্বেচ্ছা সম্মতিতে মেলা-মেশায় বা মিলনেও স্বাধীন ও মুক্ত। আর, প্রাচুর্য, উন্নতি এবং

সমৃদ্ধিতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ যেমন ভরপুর তেমনি হিংসা-বিদ্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ, বিরোধ-বৈরীতা, অসত্য-মিথ্যা, ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, জাল-জালিয়াতি, নিপীড়ন-নির্যাতন এবং খুন-ধর্ষণের মতো জঘন্য বিষয়াদি চিন্তার অতীত বিষয় বলে অপরাধ, দন্ড এবং বিচার বা বিচার ব্যবস্থাও অস্তিত্বহীন। তাই, **শান্তি,অনাবিল শান্তি এবং নিরন্তর শান্তির সমাজ হচ্ছে সমাজতন্ত্র।**

অতঃপর, নিরন্তর শান্তির সমাজ-**সমাজতন্ত্র হচ্ছে অশান্তির পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহাসিক পরিণতি**।

কারণ, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তাধীন মন্দার পরিণতি- অযৌক্তিক ব্যক্তিমালিকানার ক্রমান্বয়িক সংকোচন ও যৌক্তিক সামাজিক মালিকানার যাবতীয় শর্ত ও ভিত তৈরী করা সহ তা প্রশস্তকরণ।

সুতরাং, **পুনঃপুন মন্দার পরিণতি- অন্যায় ও অন্যায্য ব্যক্তিমালিকানার চিরাবসান তথা সামাজিক বা সাধারণ মালিকানার পূর্ণ বাস্তবায়ন**। অর্থাৎ পুঁজির বিলুপ্তি তথা পুঁজির অস্তিত্বহীনতা। তাই, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তই হচ্ছে পুঁজির অস্তিত্বহীনতার কারণ তথা পুঁজি টিকতে থাকতে গিয়ে না টিকার সকল শর্ত তৈরী করছে স্বয়ং পুঁজি।অতঃপর, **পুঁজিতন্ত্রই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি। সুতরাং, পুঁজিতন্ত্রের ঐতিহাসিক পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র।**

উল্লেখ্য, সমাজতন্ত্রই হচ্ছে সাম্যতন্ত্র। তবে, পুঁজিতন্ত্র হতে উদ্ভূত সমাজতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র হতে বিকশিত সমাজতন্ত্রের মধ্যে কিছুটা ফারাকতো থাকবেই প্রযুক্তিগত উন্নতি ও মানবিক সম্পর্ক উন্নয়নে বা প্রকৃতি বিজয়ে।

সুতরাং, পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজি ও পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক বিলীন ও বিলুপ্ত হবে তেমন জাত-জাতিহীন বা ধর্ম-বর্ণ বোধ হীন বা নারী-পুরষ বা সেক্সের নিরিখে পরিচিতির পরিচয় মুক্ত তথা রাজনৈতিক পরিচয় বিমুক্ত এক অখন্ড ও একক সত্ত্বা সম্পন্ন মানবজাতির মানবিক সমাজ-সমাজতন্ত্র হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য।

অর্থাৎ **পুঁজিতন্ত্রের পরাজয় এবং সমাজতন্ত্রের বিজয় সমানভাবে অনিবার্য ও অপরিহার্য**।

অতঃপর, পুঁজিতন্ত্র না থাকলে পুঁজি থাকার প্রশ্ন অবান্তর। কাজেই,**পুঁজির অস্তিত্বের শর্তেই পুঁজি বিলীন হবে, এটাই পুঁজির ঐতিহাসিক নিয়তি। অর্থাৎ পুঁজির অস্তিত্বের শর্তই, পুঁজির অনাস্তিত্বের শর্ত**।

সুতরাং, পুঁজি থাকছে না।

শাহ আলম । ঢাকা, ০৭, অক্টোবর, ২০১৬।